সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আমাদের কথা

১৯৪৭ সালের আগে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' এবং সাতচল্লিশের পরে রেডিও পাকিস্তান থেকে মাওলানা মওদূদী (র)-এর বেশ কিছু কথিকা প্রচারিত হয়। ইসলামের বিভিন্ন দিক, বিভাগ ও বিষয়ের উপর এসব কথিকা তিনি লিখেছেন।

এর মধ্যে কয়েকটি কথিকার সমন্বয়ে 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' নামে একটি পুস্তিকা আগেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার আমরা ১৩ টি কথিকার সমন্বয়ে সংকলিত 'নশরী তাকরীরে' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ 'ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য' নাম দিয়ে বাংলা ভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এর আগে 'আদর্শ মানব' নামে যে পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি এ গ্রন্থেরই তিনটি কথিকার আলাদা সংকলন।

কথিকাগুলো সন তারিখের ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। সাজানো হয়েছে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যক্রমে। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন পাদটীকা সংযোজিত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি সংকলনের সময় গ্রন্থকার নিজেই সেগুলো লিখে দিয়েছেন।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেমে দীন মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। গ্রন্থটি পাঠকদের অনেক উপকারে আসবে মনে করে আমরা এটি অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। আমাদের মহান রব আমাদের আশা পূর্ণ করুন। আমীন।

১৭.১১.১৯৯১

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী ঢাকা।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের সূচনা[1]

মানব জাতির সূচনাকাল থেকেই ইসলামের সূচনা হয়েছে। ইসলাম অর্থই "আল্লাহর আনুগত্য" এবং এটা মানুষের জন্মগত ধর্ম। কারণ, আল্লাহই মানুষের স্রষ্টা ও লালন পালনকারী। স্রষ্টার আনুগত্য করাই মানুষের আসল কাজ। আল্লাহ যেদিন সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রী বিবি হাওয়াকে পৃথিবীতে পঠিয়েছেন, সে দিনই তিনি তাদের বলে দিয়েছেন, দেখো তোমরা আমার বান্দাহ। আমি তোমাদের মালিক। আমার দেখানো পথই তোমাদের চলার সঠিক পথ। যে কাজের আমি হুকুম দেবো তা মেনে চলবে। যে কাজ করতে নিষেধ করবো, তা থেকে বিরত থাকবে। তোমরা এরূপ করলে আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো। তোমাদের পুরস্কার দেবো। আর যদি এর বিপরীত কাজ করো, তবে আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো এবং শাস্তি দেবো। এখান থেকেই ইসলামের সূচনা।

বাবা আদম এবং মা হাওয়া তাঁদের বংশধরদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন। কিছুকাল পর্যন্ত সকল মানুষ এ পথেই চলতে থাকে। এরপর এদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটলো, যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ছেড়ে দিলো। কেউ আবার অন্যদেরকে নিজের সৃষ্টিকর্তা বানিয়ে নিলো। কেউ নিজেই মা'বুদ হয়ে বসলো। কেউ বললো, আমি স্বাধীন। আল্লাহর হুকুম যাই হোক না কেনো, আমার মন যা চাইবে তাই আমি করবো। এভাবে দুনিয়াতে কুফরের বীজ বপন হলো। এর অর্থ আল্লাহর হুকুম মেনে চলাকে অস্বীকার কারা।

মানুষের মধ্যে কুফরী যখন বেড়ে চললো আর এ কারণে যুলুম, নিপীড়ন, ঝগড়া-বিবাদসহ বিভিন্ন গর্হিত কাজ প্রসার পেতে শুরু করলো, তখন আল্লাহ তাআলা এসব বিভ্রান্ত মানুষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁর তাবেদার বানাবার চেষ্টা করতে তাঁর নেক বান্দাদের নিয়োগ করলেন। এ নেক বান্দাদেরকেই নবী বা রাসূল বলা হয়। এ রাসূলগণ কখনো অল্প সময় পরে আবার কখনো দীর্ঘ সময় পরে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে আগমন করতে থাকনে। এরা ছিলেন খুবই সত্যবাদী, ঈমানদার,পূত পবিত্র লোক। তাঁরা সকলেই একই দীনের তা'লীম দিয়েছিলেন। আর সে দীনই ছিলো 'আল ইসলাম'। তোমরা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম,

---

১. ছোটদের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নাম তো শুনে থাকবে। এরা সকলেই আল্লাহর বাণী বাহক, রাসূল ছিলেন। এরা ছাড়াও আরো হাজার হাজার নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন।

বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে এটাই ঘটেছে। যখনই দুনিয়া কুফরীর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, তখনই কাউকে নবী-রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা মানুষকে কুফর থেকে বিরত রেখে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনার চেষ্টা চালাতে লাগলো। তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে কিছু লোক তা মেনে নিলো, আর কিছু লোক কুফরির উপর রইল অটল। যারা মেনে নিয়েছে তারা হয়ে গেলো মুসলিম। তারা তাঁদের নবী-রাসূল থেকে উন্নত চরিত্রের দীক্ষা পেয়ে সারা দুনিয়ায় সৎকাজের প্রসার ঘটাতে থাকেন। অতঃপর এ সব মুসলমানের সন্তান-সন্ততিরা ধীরে ধীরে ইসলামকে ভুলে গিয়ে কুফরের চক্করে ফেঁসে যেতে শুরু করে। এরপর আবার নতুন কোনো নবী-রাসূল এসে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের চাংগা করে তুলতেন। এ কাজের ধারাবাহিকতা হাজার হাজার বছর ধরে চলে এবং ইসলাম বার বার তাজা হয়ে আবার বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সবার শেষে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠালেন। তিনি এসে ইসলামকে এমনভাবে জাগ্রত করে তুললেন যা আজ পর্যন্ত কায়েম আছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তা কায়েম থাকবে।

আজ থেকে প্রায় পনের শত বছর আগে আরবের বিখ্যাত শহর মক্কায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময় শুধু আরবেই নয়, বরং বিশ্বের কোথাও ইসলামী হুকুমাত কায়েম ছিলো না। আগের নবী-রাসূলদের শিক্ষা দীক্ষার অল্প বিস্তর কিছু প্রভাব নেক লোকদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও আল্লাহর নির্ভেজাল তাবেদারী গোটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যেতো না। এ কারণে মানুষের চরিত্র বদলে গিয়েছিলো। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মানুষ নানা ধরনের খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থার মধ্যে মুহাম্মাদ (স) চোখ খুললেন। জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি নিজের দেশে একজন নিরব দর্শকের মত জীবন যাপন করতে থাকলেন। গোটা মক্কা নগরী তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কারণে তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতে থাকে। কিন্তু তখনো কেউ জানতোনা এ ব্যক্তিই একদিন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হিসাবে পরিচিতি লাভ করবেন। তিনিও সে সময়ে সমাজের গর্হিত ও অন্যায় কাজ দেখে মনে মনে দুঃখ পেতেন, কিন্তু তখন তিনি

ছিলেন নীরব। কারণ এই বিভ্রান্ত দুনিয়ার সংশোধনের পথ ও পদ্ধতি তখনো তাঁর জানা ছিলো না। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী হিসাবে মনোনীত করলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর উপর প্রথমে তাঁর জাতি ও পরে গোটা দুনিয়ার মানুষকে কুফরি হতে ইসলামের ছায়াতলে আসার আহবান জানাবার জিম্মাদারী সোপর্দ করেন।

এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে তিনি দেশবাসীকে প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা অন্য কারো বন্দেগী করো না। তোমাদের মালিক এবং খালিক একমাত্র আল্লাহ। শুধু তাঁরই ইবাদাত করা ও তাঁরই হুকুম মেনে চলা তোমাদের উচিত। তাঁর এ দাওয়াত শুনে সাধারণ লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরোধিতায় মেতে উঠলো। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তারা তাঁর মুখ বন্ধ করে দিতে চাইলো। কিন্তু জাতির সত্যবাদী ও খাঁটি লোকগুলো ধীরে ধীরে তাঁর সহযোগী হতে শুরু করলো। মক্কার বাইরে ও আরবের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর দাওয়াত ও শিক্ষা পৌছতে থাকে। এসব জায়গায় এ একই অবস্থা হলো। জাহিল ও মূর্খ লোকেরা বিরোধিতায় মেতে উঠে। কিন্তু জ্ঞানী ও সত্যনিষ্ঠ লোকেরা তাঁর এ সত্য দাওয়াতের উপর ঈমান আনতে শুরু করে। তের বছর পর্যন্ত অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। একদিকে সারা দেশে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে গেলো আর সত্যনিষ্ঠ লোকরা ইসলাম কবুল করে চললো। অপর দিকে জাহিল লোকদের বিরোধিতা দিন দিন তুঙ্গে উঠতে থাকে। এভাবে মুসলমানদেরকে চরমভাবে উৎপীড়িত করা হতে থাকে। অবশেষে মক্কার সরদাররা রাতের আঁধারে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে। যেনো মুসলমানদের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়।

অবস্থা এমন পর্যায় পৌছার পর আল্লাহ তাআলা হুজুর (স)-কে হুকুম দিলেন, আপনি সকল মুসলমানসহ মক্কা ছেড়ে মদীনায় গমন করুন। এ সময় মদীনারও বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা ইসলামের প্রচার, প্রসার ও অগ্রযাত্রার জন্য জানমাল কুরবানী দিতেও তৈরী ছিলেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স) এ রাতেই মক্কা হতে মদীনায় রওনা হয়ে গেলেন, যে রাতে তাঁকে হত্যা করার জন্য কাফিররা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। এটাকেই ইতিহাসে হিজরত বলে গণ্য করা হয়েছে। আর এ ঘটনার স্মারক হিসেবেই এখান থেকে হিজরী সনের হিসাব চালু করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম মদীনায় আগমন করার পরপরই আরবের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে মুসলমানরা দলে দলে মদীনায়

এসে জড়ো হতে থাকেন। এর ফলে এ শহরে স্বাভাবিকভাবে একটি ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়ে গেলো।

এ অবস্থায় ইসলামবিরোধী শক্তি আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তারা ভাবলো এতদিন মুসলমানরাতো বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিলো। তারা ছিলো অসহায়। সে অবস্থায় তাদের খতম করে দেয়া ছিলো সহজ। কিন্তু এখন তারা এক জায়গায় জড়ো হতে শুরু করছে। আবার তাদের নিজেদের একটি রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম হয়ে গেছে। তাদেরকে আরো অবকাশ দেয়া হলে, তারা একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে। তাই দ্রুত হামলা চালিয়ে তাদেরকে খতম করে দিতে হবে। এ চিন্তায় কুরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। গোটা আরব শক্তিকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করে নেয়।

কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, তারা তাঁকে না পরাস্ত করতে পেরেছে। আর না পেরেছে ইসলামের প্রচার কাজকে স্তব্ধ করে দিতে। তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার পরও আরবে ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে। স্বয়ং বিরোধীদের থেকেই ভাল ভাল লোকগুলো ইসলামের পতাকাতলে ছুটে আসে। এ অবস্থায় আটটি বছরও অতিবাহিত হতে পারলো না, এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয় করে নিলেন। মক্কার বিজয় ছিলো গোটা আরবের কুফরী শক্তির পরাজয়ের নামান্তর। এর পর এক বছরের মধ্যে গোটা আরবদেশের মানুষ মুসলমান হয়ে গেলো। বার লক্ষ বর্গমাইলের এ যমীনে ইসলামের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলো। এ রাষ্ট্রের বাদশাহী ছিলো আল্লাহর। আইন-কানুন ছিলো শরীয়তের। আর শাসন ছিলো আল্লাহর নেক বান্দাদের হাতে। এ রাষ্ট্রে যুলুম-অত্যাচার ও চরিত্রহীনতার নাম গন্ধও ছিলো না। সর্বত্রই ছিলো নিরাপত্তা আর ইনসাফ। সততা, সত্যবাদিতা ও ঈমানদারীর সায়লাব বয়ে যাচ্ছিলা সবখানে। আল্লাহ্ তাআলার তাবেদারীর কারণে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো উত্তম চরিত্র।

এভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স) তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে গোটা আরব জাতিকে বদলে দিলেন। তাদের মধ্যে এমন বীজ বপন করলেন, যার দ্বারা তারা শুধু নিজেরাই মুসলমান হলেন না, বরং গোটা বিশ্বে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডিন করার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এত বিরাট কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে নবী করীম (স) তেষট্টি বছর বয়সে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন।

তাঁর পরে সে কাজ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আঞ্জাম দিলেন, যে কাজের জন্য নবী করীম (স) দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন। এসব সম্মানিত সাহাবীগণ আরবের বাইরে দূর দূরান্তরের দেশগুলোতেও ইসলামের শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। যারা এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে দমন করেছেন। এ শিক্ষা প্রচারের পথে কোনো শক্তিই বাধা দিয়ে টিকতে পারেনি।

কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের প্রভাবে অনেক বড় বড় জাতি মুসলমান হয়ে গেল। তাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছেন, সেখানেই অন্যায়, অত্যাচার, চরিত্রহীনতা ও কলুষতা বিদূরিত হয়েছে। খোদাবিমুখ মানুষদেরকে তাঁরা আবার খোদাভীরু বানিয়েছে। মূর্খতার অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। বিবেক ও মানবতাহীন মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন। দুরাচার দুষ্কৃতিকারীদের শক্তি খর্ব করে দুনিয়ায় এমন ইনসাফ কায়েম করেছেন যার নযীর ইতিহাস আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি।

দ্বিতীয়, এর সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম (রা) মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবটি শব্দে শব্দে মুখস্ত করেছেন এবং লিখিত ভাবেও তা সর্বকালের জন্য সংরক্ষণ করে নিয়েছিলেন। এসব সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে কুরআনে মজীদ আজো আমাদের নিকট ঠিক ওই ভাষায় ও ঐ শব্দমালায় বিদ্যমান আছে, যেভাবে প্রায় সাড়ে তেরশত বছর পূর্বে তা আল্লাহর নিকট থেকে নবী করীম (স) পেয়েছিলেন। এতে একটি নুকতাও কম বেশী হতে পারেনি।

আরো একটি কাজ তাঁরা আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের সকল কর্মকাণ্ড তাঁর আলাপ-আলোচনা, কথা-বার্তা, নির্দেশাবলী, গুণাবলী, অভ্যাস অর্থাৎ প্রতিটা ব্যাপারের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে রাসূলের ইন্তেকালের পরও পরবর্তীকালের লোকেরা তাঁকে দেখতে পান, যেভাবে স্বয়ং রাসূলের জীবনকালের লোকেরা তাঁকে দেখতে পেয়েছেন। সাড়ে তেরশত বছর অতিবাহিত হবার পর আজও আমরা রাসূলের সীরাত মোবারক পাঠ করে একথা জানতে পারি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত। আর কোন্ ধরনের মানুষকে আল্লাহ পসন্দ করেন।

আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও মুহাম্মাদ (স)-এর সীরাত, এ দুটো জিনিস বড় নিয়ামত। এগুলো হুবহু সংরক্ষিত হবার কারণে চিরদিনের জন্য ইসলাম এ বিশ্বে সুরক্ষিত হয়ে গেলো। এর আগে ইসলাম দুনিয়ায় বার বার তাজা হয়ে উঠার পর আবার মন্দা হয়ে যেতো। কারণ যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলো তারা আল্লাহর কিতাব ও নবী-রাসূলদের সীরাতকে সংরক্ষিত রাখার কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়নি। এ কারণেই স্বয়ং মুসলমানের সন্তানরাই কিছুদিন পর বিভ্রান্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু এখন আল্লাহর কিতাব আর নবীর সীরাত দুটোই সংরক্ষিত আছে। আর এ কারণে ইসলাম চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আল্লাহ না করুন কোনো সময়ে যদি ইসলামের এ সজীবতায় কিছু ভাটাও পড়ে, তাহলেও এ কুরআন ও সীরাতে রাসূলের সাহায্যে তাকে আবার সজীবতায় ফিরিয়ে আনা কোনো দুঃসাধ্য কাজ নয়। এ কারণেই বিশ্বে আর কোনো নবীর প্রয়োজন বাকী থাকেনি। ইসলামকে সতেজ ও সজীব করার জন্য আজ এমন লোকই যথেষ্ট, যারা কুরআন ও সীরাতকে ভাল করে জানবে, তার উপর নিজে আমল করবে, অন্যদেরকেও আমল করাতে চেষ্টা চালাবে।

(ছোটদের অনুষ্ঠানে আলোচনা ৬ই জুলাই ১৯৪৮ ইং)

বিশ্বনেতা

আমরা মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে 'সরওয়ারে আলম' বলে থাকি, সাদামাটা কথায় এর অর্থ হলো 'বিশ্বনেতা'। হিন্দি ভাষায় এর তরজমা হলো 'জগত গুরু'। ইংরেজীতে বলে (Leader of the world)। দৃশ্যত এটা একটা বড় খেতাব। কিন্তু যে মহাসম্মানিত ব্যক্তিকে এ খেতাব দেয়া হয়েছে তাঁর জীবনের কার্যাবলী বাস্তবিকই এমন যে, তাঁকে বিশ্বনেতা বলা অতিশয় উক্তি নয় বরং এটাই তাঁর ন্যায্য পাওনা।

দেখুন, কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বনেতা বলার জন্য প্রথম শর্ত হওয়া উচিত, তিনি কোনো বিশেষ জাতি কিংবা বংশ অথবা শ্রেণীর কল্যাণের জন্য নয় বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। আপনি একজন দেশপ্রেমিক অথবা জাতীয়তাবাদী নেতার এ কারণে যত ইচ্ছা প্রশংসা করুন যে, তিনি তাঁর জনগণের যথেষ্ট সেবা করেছেন। কিন্তু আপনি যদি তাঁর স্বদেশবাসী বা স্বজাতির লোক না হন, তাহলে তিনি কোনো অবস্থাতেই আপনার নেতা হতে পারেন না। যে ব্যক্তির শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও কল্যাণকামিতা এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড চীন বা স্পেনের জন্য সীমাবদ্ধ, একজন ভারতবাসী কি কারণে তাঁকে তাদের নেতা বলে মানবে? বরং তিনি যদি নিজের জাতিকে অপর জাতি হতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সে জাতিকে পদানত করে নিজের জাতিকে উপরে উঠাতে চান, তাহলে তো অন্য জাতি তাকে নেতা মানা দূরের কথা, উল্টো তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হবে। বিশ্বের সকল জাতির মানুষ কোনো এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা শুধু তখনই স্বীকার করে নিতে পারে, যখন সে নেতার দৃষ্টিতে সকল জাতি ও সকল মানুষ হবে সমান। তিনি সমভাবে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী কল্যাণ কামনার দিক থেকে কোনো অবস্থাতেই একজনকে আরেকজনের উপর অগ্রাধিকার দিবেন না।

বিশ্বনেতা হবার জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, তিনি যে আদর্শ পেশ করেছেন তাতে বিশ্ব মানবতার পথনির্দেশে সকল সমস্যার সমাধান বিদ্যমান থাকবে। নেতা মানেই হলো পথ প্রদর্শক। উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণের পথ দেখানোর জন্য নেতার প্রয়োজন। তাই বিশ্বনেতা তিনি হতে পারেন যিনি সারা বিশ্বকে এমন নীতি পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করাবেন, যাতে সকলের কল্যাণ নিহিত।

বিশ্বনেতা হবার জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, তাঁর নেতৃত্ব কোনো বিশেষ সময়ের জন্য হবে না বরং তা হবে চিরন্তন ও শাশ্বত। যে নেতার

কর্মনীতি এক সময়ে কার্যকর হয়, আবার অন্য সময়ে হয় ব্যর্থ, তাঁকে বিশ্বনেতা বলা যায় না। বিশ্বনেতা তো তিনিই হবেন, যাঁর নেতৃত্ব দুনিয়া যতদিন কায়েম থাকবে তাতোদিন কার্যকর থাকবে।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, নেতা শুধু আদর্শ পেশ করেই ক্ষান্ত হবেন না বরং নিজের উপস্থাপিত আদর্শ অনুযায়ী সর্বপ্রথম নিজে কাজ করে দেখাবেন এবং এর ভিত্তিতেই একটি জীবন্ত সমাজব্যবস্থা তৈরি করে দেখাবেন। শুধু একটি আদর্শ প্রণয়নকারীকে খুব বেশী বললে একজন চিন্তাবিদ (Thinker) বলা যায়। তিনি নেতা হতে পারেন না। লিডার হবার জন্য স্বীয় আদর্শকে বাস্তবায়িত করে দেখাতে হয়।

এখন আসুন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি, বিশ্বনেতা হবার জন্য উল্লিখিত চারটি শর্ত এ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতটুকু পাওয়া যায়, যাঁকে আমরা বিশ্বনেতা বলে থাকি।

প্রথম শর্তটিই ধরুন। নবী করীম (স)-এর গোটা জীবন অধ্যয়ন করলে এক নজরেই অনুভব করতে পারবেন, এটা কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা বা একজন দেশ প্রেমিকের জীবন নয়। বরং একজন মানব প্রেমিক ও একজন বিশ্বজনীন আদর্শের পতাকাবাহী মহামানবের জীবনচরিত। তাঁর দৃষ্টিতে সকল মানুষই এক সমান। কোনো খান্দান, কোনো শ্রেণী কোনো জাতি, কোনো বংশ অথবা কোনো দেশের নির্দিষ্ট কোনো স্বার্থের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলো না। আমীর-গরীব, উঁচু-নিচু, সাদা, কালো, আরব-অনারব, পূর্ব-পশ্চিম, বড়-ছোট সকলকেই তিনি একই মানব গোষ্ঠীর সদস্য বলে মনে করতেন। গোটা জীবনে তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দ বা বাক্য বের হয়নি, অথবা তাঁর জীবনে এমন কোনো কাজ তিনি করেননি, যাতে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, কোনো এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের সাথে তিনি বেশী সম্পৃক্ত ছিলেন। এ কারণেই তাঁর জীবদ্দশায়ই হাবশী, ইরানী, রোমীয়, মিসরীয় এবং ইসরাঈলীরা তেমনি ভাবে তাঁর কর্মজীবনের সাথী ছিলেন, যেভাবে ছিলেন আরবরা এবং এর পরে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি খান্দান ও জাতির লোকেরা তাঁকে তেমনি ভাবেই নিজেদের পথপ্রদর্শক মেনে নিয়েছিলো যেভাবে স্বয়ং তাঁর জাতি তাঁকে পথপ্রদর্শক মেনে নিয়েছিলো। এটাতো সেই মহামানবেরই বিস্ময়কর কৃতিত্ব যে, আপনারা একজন ভারতবাসীর[১] মুখেও সেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রশংসা শুনছেন, যিনি শত শত বছর পূর্বে আরবে জন্মগ্রহণ

১. এ ভাষণ পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হবার আগের, যখন দুটি দেশ একই দেশ ছিলো।

করেছিলেন। বিশ্বনেতা হবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাক। হযরত মুহাম্মাদ (স) কোনো বিশেষ জাতি এবং বিশেষ দেশের সমকালীন ও স্থানীয় সমস্যার আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করেননি। বরং তিনি তাঁর গোটা জীবন মানবতার সেই সব বড় বড় সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যয় করেছেন, যার দ্বারা গোটা মানব জাতির সকল ছোট ছোট সমস্যা। এমনিতেই সমাধান হয়ে যায়। সে সব বড় বড় সমস্যা কি ? তা ছিলো কেবল ঃ

> "বিশ্বের সার্বিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবিকপক্ষে যে নীতিমালার উপর কায়েম রয়েছে মানুষের জীবনযাপন ব্যবস্থাও তদ্রূপ হতে হবে। কেননা মানুষ সৃষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর একটি অংশের চলন গোটা জিনিসের বিপরীত হওয়াটাই অনিষ্টের মূল কারণ।"

একথাটিকে সহজভাবে বুঝার জন্য আপনি আপনার দৃষ্টিকে একটু চেষ্টা করে স্থান কালের বন্ধন থেকে মুক্ত করে গোটা দুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ভবিষ্যতে সীমা সংখ্যাহীন কাল পর্যন্তকার সকল মানুষকে একসাথে আপনার চোখের সামনে রাখুন। এরপর লক্ষ করুন মানুষের জীবনে পাপাচার ও অনাচারের কত ধরন সৃষ্টি হয়েছে অথবা হওয়া সম্ভব। এ সবের মূল কারণ কি, বা কি হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনি যত চিন্তা-ভাবনাই করবেন, যত অনুসন্ধানই করবেন মূল কারণ একটিই পাবেন। তাহলো ঃ

> "সকল অনিষ্টের মূল কারণ আল্লাহর সাথে মানুষের বিদ্রোহ।"

আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে মানুষ অবশ্যম্ভাবীরূপে দুটো অবস্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করে। হয় সে নিজেকে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন মনে করে মনগড়া পথে চলতে শুরু করে। আর এ অবস্থা তাকে যালিম বানিয়ে দেয়। অথবা সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুমের সামনে মাথা অবনত করতে শুরু করে। এর ফলে দুনিয়ায় অসংখ্য রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এখন ভাববার বিষয় হলো, আল্লাহ থেকে বিমুখ হলে এ সকল অনিষ্ট ও বিপর্যয় কেন সৃষ্টি হয় ? এর সোজা পরিষ্কার জবাব হলো, এরূপ করা যেহেতু প্রকৃত অবস্থার বিপরীত, সে জন্যই এর ফল খারাপ হয়। এ গোটা বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই সাম্রাজ্য। তিনিই পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ, পানি, আলো সবকিছুরই মালিক, মানুষ এ সাম্রাজ্যের জন্মগত দাস। এ গোটা সালতানাত যে নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, মানবজাতি এর একটি অংশ হয়েও যদি ঐ ব্যবস্থার বিপরীত কোনো পথ অবলম্বন

করে, তাহলে অবশ্যই তার অনুসৃত এ পথ তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। 'আমার উপর আর কোনো উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কেউ নেই। যার সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে' তার এ ধারণাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বাস্তবতার খেলাফ। এজন্য সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন পদ্ধতিতে কাজ করে নিজের জীবনযাপন পদ্ধতি নিজেই রচনা করে। ফলে তার জীবনে আসে ধ্বংস ও অকল্যাণ। একইভাবে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেও স্বাধীন ক্ষমতার মালিক মানা এবং তাকে ভয় করে চলা, তার থেকে কোনো কিছুই প্রত্যাশা করা, তার প্রভুত্বের সামনে মাথা নত করাও প্রকৃত সত্যের খেলাফ। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ গোটা বিশ্বজাহানে আল্লাহ ছাড়া কেউ এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। তাই এরূপ কর্মনীতির পরিণতিও অনিষ্টকরই হয়ে থাকে। আসমান ও যমীনের যিনি প্রকৃত মালিক ও বাদশাহ, তাঁর সামনে মাথা নত করে দেয়া, নিজের ইচ্ছা ও ইচ্ছা শক্তিকে তাঁর মর্জির সামনে সমর্পণ করে দেয়া, নিজের আনুগত্য ও বন্দেগী তাঁরই জন্য নিবেদিত করা এবং জীবন যাপনের সার্বিক ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও নিয়ম কানুন নিজে রচনা না করে বা অন্যের কাছ থেকে না নিয়ে তাঁর কাছ থেকে নেবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সুফল। অন্য কোনো পথে নয়।

এ বুনিয়াদী সংশোধনের ব্যবস্থা মুহাম্মাদ (স) মানব জীবনের জন্য পেশ করেছেন। পূর্ব পশ্চিমের নাগপাশ থেকে এ ব্যবস্থা মুক্ত। দুনিয়ার বুকে যেখানে যেখানে মানুষের বসতি আছে সংস্কার সংশোধনের এই ফর্মুলা তাদের সকলের জীবনের সমস্ত বিকৃতিকে শুধরে দিতে সক্ষম। আর এ ব্যবস্থা অতীত ও বর্তমানের আওতামুক্ত। দেড় হাজার বছর পূর্বে এ ব্যবস্থা যেমন কার্যকর ছিলো আজো তেমনি আছে। দশ হাজার বছর পরেও তা কার্যকর থাকবে।

এবার বিশ্বনেতা হবার সর্বশেষ শর্তটি আলোচনা করা যাক। এটা ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তব ঘটনা যে, মুহাম্মাদ (স) শুধু কাল্পনিক চিত্রই পেশ করেননি বরং পেশকৃত ধারণার উপর একটি জীবন্ত সমাজও গড়ে দেখিয়েছেন। তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে লাখ লাখ মানুষকে আল্লাহর হুকুমাতের সামনে আনুগত্যের শির অবনত করতে প্রস্তুত করেছেন। আত্মপূজা থেকে তাদের মুক্ত করেছেন। মুক্ত করেছেন গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে। এরপর তাদেরকে একত্র করে আল্লাহর নির্ভেজাল বন্দেগীর জন্য একটি নতুন চরিত্রগঠন পদ্ধতি, নতুন তামাদ্দুন গঠন প্রণালী, নতুন অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র কাঠামোর রচনা করেছেন। আর সমগ্র বিশ্বের সামনে

এ কথার বাস্তব অনুশীলন করে দেখিয়েছেন যে, যে আদর্শ তিনি পেশ করেছেন, তার ভিত্তিতে কিভাবে গড়ে ওঠে মানব জীবন। অন্যান্য জীবন পদ্ধতির তুলনায় এ জীবন পদ্ধতি কত উত্তম, কত পবিত্র এবং কতটা সততার।

এসব কৃতিত্ব ও অবদানের কারণেই আমরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সরওয়ারে আলম বা বিশ্বনেতা বলে আখ্যায়িত করি। তাঁর এসব কাজ কোনো বিশেষ জাতির জন্য ছিলো না। ছিলো সমগ্র মানবতার জন্য। এটা গোটা মানবতার সম্মিলিত উত্তরাধিকার। এ সম্পদে কারো হক কারো চেয়ে বেশী কম নেই। যিনিই ইচ্ছা করেন, এই উত্তরাধিকার থেকে উপকৃত হতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি না এর বিরুদ্ধে কারো কোনো বিদ্বেষ থাকার কি কারণ থাকতে পারে।–১০ এপ্রিল ১৯৪১ ইং

মীলাদুন্নবী

আজ সেই মহামনীষীর জন্মদিন, আদর্শ মহামানব যিনি যমীনে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীর জন্য রহমত হিসেবে আগমন করেছিলেন। তিনি সাথে করে এমন একটি আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন যা অনুকরণ করলে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জাতি ও দেশ এবং গোটা মানবজাতি সমানভাবে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে। তার জন্মদিন যদিও সকল কালেই এসেছিলো তবু বর্তমানে তা আসে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংকট কালে যখন পৃথিবীর মানুষ সকল বিষয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পথ নির্দেশনার মুখাপেক্ষী সকল সময়ের চাইতে অধিক। জানিনা মিস্টার বার্নার্ডশ ভালো করে জেনে বুঝেই বলেছিলেন নাকি না জেনে না বুঝে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা ছিলো পরিপূর্ণ সত্য। তিনি বলেছিলেন, মুহাম্মাদ (স) যদি এ সময়ে বিশ্বের ডিক্টেটর হতেন তাহলে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। আমি এর চেয়ে এক কদম অগ্রসর হয়ে বলবো, মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ায় বেঁচে নেই ঠিক কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ তো হুবহু আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। তাঁর আদর্শকে সত্যিকারভাবে যদি আমরা ডিক্টেটর হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে পৃথিবী থেকে সকল বিপর্যয়ের অবসান ঘটতে পারে, যার আগুনে আদম সন্তানদের ঘর জাহান্নামে পরিণত হয়েছে।[১]

এখন থেকে পনর শত বছর আগে মুহাম্মাদ (স) যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন তখন স্বয়ং তাঁর জন্মভূমিই নৈতিক অধঃপতন, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। কুরআন মজীদে অবস্থার চিত্র এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, "আগুন ভর্তি একটি গুহার পারে তোমরা দাঁড়িয়েছিলে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করেছেন। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থা এর চেয়ে তেমন ভালো ছিলো না। ইরান ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য সে সময় মানব সভ্যতার দুটো সবচেয়ে বড় লীলাভূমি ছিলো। এ দুটো দেশকে একদিকে তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যদিকে তাদের স্ব স্ব দেশের সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং ধর্মীয় ঝগড়া-বিবাদ তাদেরকে চরম অধঃপতনে নিমজ্জিত করে রেখেছিলো। এ অবস্থায় মুহাম্মাদ (স) তাঁর মিশন নিয়ে উঠলেন এবং তেইশ বছরের মাত্র সিকি শতাব্দীর মধ্যে তিনি শুধু আরব ভূমিই নয় বরং তাঁর নেতৃত্বে আরব থেকে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিলো ভারত

১. উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম ধ্বংসযজ্ঞের সময় মাওলানা এ ভাষণ দিয়েছিলেন।—অনুবাদক

সীমান্ত থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত দুনিয়ার একটা বৃহৎ অংশকে নৈতিকতা, সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি মোটকথা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে তা পরিশুদ্ধ করে ছেড়েছে।

এ সংস্কার সংশোধন কিভাবে সাধিত হলো ? একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে এর যাবতীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবু এর মৌলিক নীতিমালা আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করবো ঃ

প্রথম নীতিমালা

সর্বপ্রথম যে জিনিসের উপর তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন তা ছিলো সকল মানুষ শুধু এক আল্লাহকে নিজের মালিক, মনিব, মাবুদ এবং হাকিম হিসেবে মেনে নেবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করবে না। শুধু ধর্মের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই নয় বরং জীবনের সকল ব্যাপারে শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে।

দ্বিতীয় নীতিমালা

এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিলো মানুষের যথেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতাকে সমূলে বিনষ্ট করে দিতে হবে। প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ বলে মনে করবে। একইভাবে মানুষের সমস্ত দল এবং গোষ্ঠী মনে করবে, আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। চাই তারা বংশ ও গোত্রের রূপে হোক অথবা শ্রেণীগত রূপে, জাতীয়রূপে হোক কিংবা রাষ্ট্র ও হুকুমাতের রূপে—মোটকথা আল্লাহর ভয়ে স্ব স্ব দায়বদ্ধতার কথা সচেতনভাবে অনুভব করবে। মুহাম্মাদ (স) মানুষের ধারণাই এভাবে পেশ করেছেন। তারা এ দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। তাকে যতটুকু ও যে অবস্থায়ই কিছু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা তার নিজস্ব স্বাধীনতা নয় বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত এবং এ স্বাধীনতার ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত তাকে আল্লাহর সমীপে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব আর মানুষের খিলাফতের ভিত্তির উপর মুহাম্মাদ (স) এমন ইনসাফভিত্তিক ঐক্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, যা অন্য কোনো উপায়ে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিলো না। বংশ-গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ, দেশ বা অর্থনৈতিক স্বার্থসহ আর যত জিনিস সমাজের বুনিয়াদ হতে পারে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেয়। এদের মধ্যে যদি কখনো

কোনো মিল হয়ও তা হয় শুধু স্বার্থের কারণে অপূর্ণ, কৃত্রিম ও অস্থায়ী-ভাবে। এ বিভক্তির প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বেইনসাফী। সকল মানুষকে আল্লাহর বন্দেগীর উপর একত্র করা ও সকলের মধ্যে তাঁর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করা ছাড়া এ বেইনসাফী দূর করার আর কোনো উপায় নেই। জবাবদিহি করার অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমেই তাদেরকে ইনসাফের দিকে ধাবিত করা সম্ভব ।

জাতীয়তাবাদ ও শ্রেণী-গোষ্ঠীর স্থলে আল্লাহর দাসত্ব আর খিলাফতের ধারণার উপর রাসূল (স) বিশ্বজনীন সমাজ জীবনের যে ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন তার প্রতিটি দিককে তিনি স্থায়ী নৈতিক নীতিমালার কাঠামোতে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার উপস্থাপিত নীতি নৈতিকতা দুনিয়া ত্যাগী দরবেশদের জন্য ছিলো না, বরং তা ছিলো দুনিয়া পরিচালনাকারীদেরই জন্য। কৃষক, জমিদার, শ্রমিক, কারিগর, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, জজ, গভর্নর, সিপাহি, সিপাহসালার, মন্ত্রী, দূতসহ প্রতিটি ক্ষেত্রের লোককে তা তার কর্মক্ষেত্রে তিনি নৈতিকতার এমন সব বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রত করেছেন, যেগুলো লংঘন করা, সংকোচিত করা কিংবা ভাঙা বা গড়া কোনো জনগোষ্ঠীর সর্বসম্মত ইচ্ছার উপর পর্যন্ত নির্ভরশীল নয়। তিনি সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে শিল্প ও সাহিত্যকে, ব্যবসা-বাণিজ্যকে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যুদ্ধ ও সন্ধিকে মোটকথা মানব জীবনের সকল ব্যাপারকে নীতি নৈতিকতার অনুসারী করে দিয়েছেন। যে জিনিসই মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত হবে তার এ অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়েছে যে, সে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত হয়ে বিকাশ লাভ করতে পারবে।

এগুলো হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান প্রধান নীতিমালা। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর সংশোধন ও সংস্কার কর্মসূচী রচনা করেছেন। এ কর্মসূচীকে কার্যকর করার জন্য তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা ব্যক্তিগত সংশোধনের মাধ্যমেই সম্মুখে অগ্রসর হয়। তাঁর একথা অজানা ছিলো না যে, সামষ্টিক জীবনের সংশোধনের প্রতিটি নকশার ভিত্তি অবশ্যি ব্যক্তির উপর বর্তায়। দুর্বল চরিত্র, অবিশ্বাসী ও অনির্ভরযোগ্য লোক নিয়ে কোনো উত্তম জীবনব্যবস্থাও সফলতার সাথে পরিচালনা করা যায় না। ব্যক্তির নৈতিকতার ক্রুটিতে একটি জীবনব্যবস্থা কার্যকর হবার পথে যে ছিদ্র ও ফাটল সৃষ্টি হয় তা কাগজ দিয়ে মেরামত করা যায় না। কাগজ দিয়ে যতটা ইচ্ছা আপনি বিভিন্ন দোষক্রুটির পথ কাল্পনিকভাবে

বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারেন ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে কাগজের নকশা পরিচালনার দায়িত্ব সর্বাবস্থায়ই মানুষের ওপর বর্তাবে। এ মানুষগুলো যদি আত্মপূজারী হয়, স্বীয় স্বার্থ ও কোটারী চিন্তার কাছে পরাভূত হয়ে যাবার লোক হয় যদি এদের মধ্যে সত্য ঈমান, উন্নত ও মযবুত চরিত্র না থাকে তাহলে আপনার সকল কাল্পনিক সতর্কতা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থায় ত্রুটি থেকে যাবেই। এমন এমন স্থানে এ ত্রুটি থেকে যাবে যা আপনি ধারণাও পর্যন্ত করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে কাগজে চিত্রিত একটি জীবনব্যবস্থা দেখে আপনি তাতে অনেক ত্রুটির সম্ভাবনা প্রমাণ করতে পারবেন। কিন্তু তা পরিচালনার জন্য যদি নির্ভরযোগ্য লোক পাওয়া যায় তাহলে তার নির্ভুল কার্যক্রম ওই সব দোষত্রুটিকে বিদূরিত করে দেবে, যেগুলোর সম্ভাবনা কল্পনার জগতে আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো।

এ কারণেই মুহাম্মাদ (স) সর্বপ্রথম নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এমন সব লোক তৈরী করতে, যারা তাঁর কর্মসূচী অনুযায়ী সর্বোত্তম পদ্ধতিতে দুনিয়া সংশোধন করতে সক্ষম হবেন। তিনি এমন সব লোক গঠন করেছিলেন, যারা সবসময় আল্লাহর ভয়ে পাপাচার থেকে বিরত থেকেছেন, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট দায়িত্বের জবাবদিহি করার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন সব কাজ থেকে বিরত থেকেছেন এবং ওই কাজ তারা জানপ্রাণ দিয়ে সমাপন করার চেষ্টা করেছেন যে কাজ করলে আল্লাহ খুশি হবেন বলে তারা জানতে পেরেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাদের মনে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কারো ভয়, কারো অনুকম্পার লোভ, কারো নিকট কোনো পুরস্কার পাবার কামনা ছিল না। তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। পর্দার অন্তরালে তারা এতটা নেক, শরীফ ও পরহেযগার ছিলেন যতটা ছিলেন সর্বসাধারণের সামনে। তাদের উপর এই আস্থা রাখা গিয়েছিলো যে, আল্লাহর বান্দাদের জীবন-সম্পদ, মান-ইয্যত যদি তাঁদের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা খিয়ানতকারী প্রমাণিত হবেন না, ব্যক্তিগতভাবে অথবা জাতি বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে যদি কোনো অঙ্গীকার তাঁরা করেন তাহলে তা ভঙ্গকারী হবেন না, ইনসাফের কুরছিতে বসানো হলে যালিম হিসেবে তাঁদের পাওয়া যাবে না। লেনদেনে বিশ্বস্ত ও নির্ভযোগ্য প্রমাণিত হবেন। কারো হক আদায় করার ব্যাপারে ত্রুটি করবেন না। নিজের বুদ্ধিমত্তা, সতর্কতা, চিন্তাধারা, ক্ষমতা-যোগ্যতাকে সঠিক ও ইনসাফের জন্য এবং মানবতার কল্যাণের জন্য

ব্যবহার করবেন, ব্যক্তিগত বা গোত্রীয় স্বার্থে অপরকে বোকা বানানো ও অন্যদের হক মারার জন্য ব্যবহার করবেন না।

পরিপূর্ণ পনরটি বছর পর্যন্ত মুহাম্মাদ (স) এ ধরনের মানুষ তৈরির কাজে লেগে থাকলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি সত্যনিষ্ঠদের একটি ছোট্ট দল তৈরী করলেন। এরা শুধু আরবের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্বজগতের সংশোধনের জন্য দৃঢ় ও নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প পোষণ করতেন। আর এ দলে যেমন ছিলো আরবের লোকেরা, তেমনি ছিলো অনারবরাও।

এ দলটিকে সুসংগঠিত করার পর নবী করীম (স) ব্যাপকভাবে সমাজ সংশোধন ও সংস্কারের জন্য কার্যকরী চেষ্টা সংগ্রাম চালাতে শুরু করলেন। মাত্র আট বছরে বার লাখ বর্গমাইল বিস্তৃত আরব ভূখণ্ডে পরিপূর্ণ নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন।

তারপর এ ক্ষুদ্র দলটিই, যাকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন—আরব ভূখণ্ডের সংশোধনের পর সামনে অগ্রসর হলো। তাঁরা সে সময়কার সভ্য জগতের অধিকাংশ অংশকে সেই ইনকিলাবের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধশালী ও সৌভাগ্যবান বানিয়ে দেন, যা আরবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

(৩০ মার্চ ১৯৪২)

বিশ্বনেতার প্রকৃত অবদান

বিশ্ববাসী জানেন, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স) মানবতার সেই মহান ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত, যারা প্রাচীনকাল হতে মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদাত ও নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেবার জন্য দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন। এক আল্লাহর বন্দেগী এবং পবিত্র নৈতিক জীবনের শিক্ষা, যা সবসময় দুনিয়ার নবী-রাসূল ঋষি ও মুনিগণ দিচ্ছিলেন, সেই শিক্ষা নবী মুহাম্মাদ (স) দিয়েছেন। তিনি কোনো নতুন রবের ধারণা পেশ করেননি এবং অন্য কোনো দুর্লভ চরিত্রেরও সবক দেননি, যা তাঁর পূর্বেকার মানবতার পথ প্রদর্শকদের শিক্ষা হতে ভিন্ন ছিলো, যার কারণে আমরা তাঁকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব বলে থাকি।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, নিশ্চয় মহানবী (স)-এর আগের লোকেরা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর একত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কিন্তু একথা পরিপূর্ণভাবে অবহিত ছিলো না যে, এ দার্শনিক সত্যের মানুষের নৈতিকতার সাথে কি সম্পর্ক রয়েছে। নিসন্দেহে মানুষ নৈতিকতার উত্তম নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে তাদের জানা ছিলো না যে, জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে এই নৈতিক নীতিমালার বাস্তব অনুশীলন কিভাবে হওয়া উচিত। আল্লাহর উপর ঈমান, নৈতিক নীতিমালা ও কর্মময় জীবন এ তিনটি ছিলো পৃথক পৃথক জিনিস যেগুলোর মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক এবং কোনো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র বিদ্যমান ছিলো না। কেবল মুহাম্মাদ (স) সর্বপ্রথম এ তিনটিকে একত্রে যুক্ত করে একটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এগুলোর এই মিশ্রণের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ শুধু কল্পনার জগতে নয়, বরং কর্মের জগতেও কায়েম করে দেখিয়ে দেন।

তিনি বলেছেন, আল্লাহর উপর ঈমান শুধু দার্শনিক সত্যকে মেনে নেয়ার নাম নয়, বরং এই ঈমান তার প্রকৃতি ও ফিতরাত অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনের নৈতিকতার দাবী করে এবং এই নৈতিকতার প্রকাশ মানুষের বাস্তব জীবনের গোটা আচরণেই হওয়া উচিত। ঈমান একটি বীজ, যা মানুষের মনে শিকড় গাড়তেই নিজের প্রকৃতি মোতাবেক আমলী যিন্দেগীর একটি পূর্ণ বৃক্ষ সৃষ্টি শুরু করে দেয়। সেই বৃক্ষের কাণ্ড থেকে শুরু করে তার ডালপালা ও লতাপাতায় পর্যন্ত নৈতিকতার সেই জীবনরস প্রবাহিত হতে শুরু করে, যার শিরা উপশিরা অংকুরের শিকড়ের সাথে সংযুক্ত। যেমন যমীনে আমের বীজ লাগালে তা থেকে লেবুর চারা গজানো

সম্ভব নয়, তেমনি অন্তরে আল্লাহভীতির বীজ বপন করা হলে তা থেকে বস্তুবাদী জীবন গড়ে ওঠাও সম্ভব নয়, যার প্রতিটি শিরায় শিরায় চরিত্রহীনতার প্লাবন ছড়িয়ে থাকে। আল্লাহভীতি হতে সৃষ্ট আখলাক এবং শিরক (পৌত্তলিকতা), দাহরিয়াত (ধর্মদ্রোহিতা) ও রুহবানিয়াত (বৈরাগ্য) সৃষ্ট আখলাক এক সমান হতে পারে না। জীবনের এসব আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের অধিকারী। একটির মেজাজ অপরটি হতে ভিন্ন ধরনের আখলাক সৃষ্টি করে। আল্লাহভীতির ফলে যে আখলাক সৃষ্টি হয় তা শুধু বিশেষ কোনো আবেদ, জাহেদ গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট নয় যে, শুধু খানকাহর চার দেয়ালের মধ্যে অথবা সংসারত্যাগীর নির্জন কক্ষেই তার বিকাশ ঘটতে পারে। গোটা মানবজীবন ও তার প্রতিটি দিক ও বিভাগে ব্যাপকভাবে এর প্রকাশ ঘটা উচিত। একজন ব্যবসায়ী যদি আল্লাহভীরু হয়, তাহলে আল্লাহভীতি জনিত আখলাক তার থেকে প্রকাশ না পাবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। একজন বিচারক যদি আল্লাহভীরু হন, তাহলে বিচারকের চেয়ার এবং একজন পুলিশের মধ্যে যদি আল্লাহভীতি থাকে তাহলে পুলিশের দায়িত্ব পালনকালে তার থেকে আল্লাহদ্রোহী আখলাক প্রকাশ পেতে পারে না। এভাবে কোনো জাতি যদি আল্লাহভীরু হয়, তাহলে তার নাগরিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, পররাষ্ট্রনীতিতে, যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে আল্লাহভীতি জনিত আখলাক প্রকাশ হতেই হবে। অন্যথায় তার আল্লাহর উপর ঈমান কথাটা শুধু একটি অর্থহীন শব্দে পরিণত হবে।

এখন কথা হলো আল্লাহভীতি কি ধরনের নৈতিক চরিত্র দাবী করে । আর সে সব আখলাক কিভাবে মানুষের জীবনে, ব্যক্তির জীবনে ও সমাজ জীবনে প্রকাশ পাবে। বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার দাবী রাখে। ক্ষুদ্র পরিসরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু নমুনাস্বরূপ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকটি হাদীস আপনাদেরকে শুনাবো। তা থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, মহানবী (স)-এর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থায় ঈমান, আখলাক ও আমলের সংমিশ্রণ কি ধরনের ছিলো। মহানবী (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ ـ

"ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা প্রশাখা আছে । তার মূল ও সবচেয়ে উত্তম শাখা হলো একথার ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো

মাবুদ নেই। আর এর শেষ ও সাধারণ শাখা হলো চলাচলের পথে যদি তোমরা এমন কোনো জিনিস দেখো, যাতে আল্লাহর বান্দাদের কোনো কষ্ট হতে পারে, তাহলে তা সরিয়ে ফেলা। লজ্জাশীলতা ঈমানেরই একটি অঙ্গ।"[১]

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ـ

"দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اٰمِنَهُ النَّاسَ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

"মুমিন সেই ব্যক্তি, যার দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ও সম্পদের কোনো বিপদের আশংকা করে না।"

لَاَاِيْمَانَ لِمَنْ لَااَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهُ ـ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর সে লোক বেদীন, যে অঙ্গীকার পালন করে না।"

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّاٰتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ ـ

"তোমার ভালো কাজ যদি তোমাকে আনন্দিত করে আর খারাপ কাজ অনুতপ্ত করে, তাহলে তুমি মুমিন।"

اَلْاِيْمَانُ اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ـ

"ঈমান হলো ধৈর্য ও উদার মনের নাম।"

اَفْضَلُ الْاِيْمَانِ اَنْ تُحِبُّ لِلّٰهِ وَتَبْغَضَ لِلّٰهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَنْ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهِ لَهُمْ مَاتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ـ

"উত্তম ঈমান হলো, তোমার বন্ধুত্ব এবং তোমার শত্রুতা হবে আল্লাহ তাআলার জন্য। তোমার মুখে আল্লাহর নাম জারি থাকবে। আর তুমি অন্যদের জন্যও সেই জিনিস পসন্দ করবে, যা তোমার নিজের জন্য পসন্দ করো। আর অন্যদের জন্য তাই অপসন্দ করবে, যা তোমার নিজের জন্য অপসন্দ করো।"

---

১. প্রকাশ থাকে যে, এর আরবী ইবারাত সম্প্রচার করা হয়নি। শুধু তরজমা সম্প্রচার করা হয়েছে।

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ ـ

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার হলো সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে সদ্ব্যবহারে সকলের চেয়ে অগ্রসর।"

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সমাদর করে, প্রতিবেশীদের কষ্ট না দেয় এবং মুখ থেকে ভালো কথা বের করে, অন্যথায় নীরব থাকে।"

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ بِاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ ـ

"মু'মিন ব্যক্তি কখনো কটাক্ষ করতে পারে না, অভিশাপ দিতে পারে না, খারাপ ও অশ্লীল কথা বলতে পারে না।"

يَطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِصَالِ كُلِّهَا اِلاَّ الْخِيَانَةِ وَالْكِذْبَ ـ

"মু'মিন ব্যক্তি সবকিছুই হতে পারে, কিন্তু মিথ্যুক ও আত্মসাৎকারী হতে পারে না।"

وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ الَّذِىْ لاَيَاْمَنْ جَارَهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

"আল্লাহর শপথ! সেই ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর শপথ! সেই ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর শপথ! সেই ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না, যার ক্ষতি হতে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارَهٗ جَائِعُ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

"যে ব্যক্তি পেট ভরে খাবে আর তার পাশে তার প্রতিবেশী ভুখা থাকবে, সে মু'মিন হতে পারে না।"

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرَ على اَنْ يَنْفُذَهٗ مَلاَ اللّٰهُ قَلْبَه امنًا وَايمَانًا ـ

"যে ব্যক্তি রাগ প্রকাশ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে, তার হৃদয় আল্লাহ তাআলা ঈমান ও প্রশান্তিতে ভরে দেন।"

مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيقْوِيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ

"যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারিকে অত্যাচারী জেনেও তার সহযোগিতা করে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলো।"

مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

"যে ব্যক্তি লোকদের দেখাবার জন্য নামায পড়লো, সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোকদের দেখাবার জন্য রোযা রাখলো, সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোকদের দেখাবার জন্য দান খয়রাত করলো, সে শিরক করলো।"

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا اِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

"চারটি এমন গুণ আছে, যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফিক। কোনো জিনিস তার কাছে গচ্ছিত থাকলে সে তা আত্মসাৎ করে, যখন কোনো কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোনো ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, এবং যখন ঝগড়া করে তখন ভদ্রতার সীমালংঘন করে।"

عَدَلَتِ الشَّهَادَةَ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ـ

"মিথ্যা সাক্ষী দেয়া এমন বড় গুনাহ যে তা শিরকের কাছাকাছি পৌছে যায়।"

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ ـ

"প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রকৃত হিজরতকারী সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো ত্যাগ করে।"

اَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ اِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالُوْا اَللّٰهُ

وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا اُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَاِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا كَحُكْمِهِمْ لِاَنْفُسِهِمْ ـ

"তোমরা কি জানো কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় সকলের আগে কে স্থান পাবে ? শ্রোতাগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি যার সামনে সত্যকে পেশ করার সাথে সাথে তা মেনে নিয়েছে, যখনই তার থেকে কোনো হক চাওয়া হয়েছে তখনই তা খোলা মনে দিয়ে দিয়েছে, অন্যের ব্যাপারে এমন ফায়সালা করেছে, যা সে নিজের ব্যাপারেও পসন্দ করে।"

اَضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَصْدِقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَادُّوْا اِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغَضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ ـ

"ছয়টি জিনিসের ব্যাপারে তোমরা আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারি। যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পালন করবে, আমানতের পুরাপুরি হক আদায় করবে, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে, কুদৃষ্টি দিবে না এবং অত্যাচার করা থেকে হাতকে বিরত রাখবে।

لَايَدْخُلُوا الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ ـ

"প্রবঞ্চনাকারী, কৃপণ এবং উপকারের খোটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।"

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

"জান্নাতে এমন গোশত (দেহ) প্রবেশ করতে পারবে না যা হারাম খাদ্যে গড়ে উঠেছে। হারাম জিনিস লালিত শরীরের জন্য জাহান্নামের আগুনই বেশী উপযুক্ত।"

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهٗ ـ

"যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ জিনিস বিক্রি করলো খরিদদারকে অবহিত না করে সে সর্বদা আল্লাহর অসন্তোষের মধ্যে থাকে। ফেরেশতাগণও তাকে সর্বদা অভিসম্পাত করতে থাকে।

لَوْ اَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَاذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهُ ـ

"কোনো ব্যক্তি যতবারই জীবনপ্রাপ্ত হোক না কেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে যতবারই শহীদ হোক না কেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যদি সে ঋণগ্রস্ত থাকে এবং তা পরিশোধ না করা হয়ে থাকে।

اَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ـ

"কোনো পুরুষ বা মহিলা ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাাহর ইবাদাতে রত আছে। মৃত্যুর সময় সে ওসিয়তের মাধ্যমে হকদারের হক নষ্ট করল, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।"

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَائِكَةِ ـ

"নিজের অধীনস্ত কর্মচারিদের সাথে খারাপ আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

اَلَا اُخْبِرُكُم بِاَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ ؟ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَاِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَهِ ـ

"আমি কি তোমাদেরকে রোযা, দান-খয়রাত ও নামায থেকেও উত্তম জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো না ? তাহলো দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করে দেয়া। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরানো এমন জঘন্য ব্যাপার যা মানুষের গোটা জীবনের নেক কাজ ধ্বংস করে।"

اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِى مَنْ يَاْتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاْتِى قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ ـ

"প্রকৃত মুফলিস বা কাঙাল ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার সাথে নামায, রোযা, যাকাত সবই থাকবে, কিন্তু সাথে সাথে সে কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছে, কারো ধন-সম্পদ মেরে খেয়েছে, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছে, কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। এরপর আল্লাহ তার এক এক নেক কাজ মযলুমকে বন্টন করে দেবেন। এরপর যখন হিসাবে টান পড়বে তখন মযলুমদের গুনাহগুলো এনে তার ভাগে দিয়ে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

"লোকেরা যদি ব্যাখ্যা করে করে নিজেদের নফসের খারাপ কাজের ব্যাপারে পরিতৃপ্ত না করে থাকে, তাহলে তারা যেন নাজাত প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ না হয়।"

اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ۔

"যে ব্যবসায়ী মূল্য বাড়াবার জন্য মালপত্র গুদামজাত করে রাখে, সে অভিশপ্ত।"

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ۔

"যে ব্যক্তি মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে তার সাথে আল্লাহর ও আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً۔

"খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গুদামজাত করে রাখার পর যদি মানুষ তা দান খয়রাতও করে দেয় তবুও তাতে তার অপরাধের প্রতিবিধান হবে না।"

রাসূলে করীমের বাণীসমূহের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নমুনা হিসেবে এখানে আমি পেশ করলাম। এর থেকে আপনারা অনুমান করতে পারবেন রাসূল (স) ঈমানের সাথে আখলাকের এবং আখলাকের সাথে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সম্পর্ক কিভাবে কায়েম করেছেন। ইতিহাস অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন তিনি একথাগুলোকে শুধু কথার সীমা পর্যন্তই

রেখে দেননি বরং বাস্তব ক্ষেত্রেও একটি গোটা দেশের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এসব বুনিয়াদের উপর কায়েম করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি এসব অবদানের ভিত্তিতেই মানবজাতির সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শকের আসনে আসীন হয়ে আছেন।

−(২২শে জানুয়ারী ১৯৪৮)

মে'রাজ রজনী

সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী আজকের রাতই মে'রাজের রাত। এই মে'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলোর অন্যতম। কিন্তু তা যতটা বিখ্যাত ঠিক ততটা কল্পকাহিনীর আবরণ এর উপর পড়েছে। সাধারণ লোকেরা কৌতুহলপূর্ণ ঘটনা শুনতে খুব পছন্দ করে। তাদের এই কৌতুহলপ্রিয়তার আবেগ প্রশমনের খোরাকতো চাই। তাই মে'রাজের প্রাণশক্তি, তার উদ্দেশ্য, ফায়দা ও ফলাফলকে তারা উপেক্ষা করেছে এবং সমস্ত আলোচনা এ বিষয়ে হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (স) কি সশরীরে আসমানে গিয়েছেন না রুহানীভাবে ? বুরাক কি ? ফেরেশতা কি আকৃতির ছিলো ? ইত্যাদি।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা মানব ইতিহাসের সেইসব বড় ঘটনার একটি যেগুলো কালের গতি বদলে দিয়েছে এবং ইতিহাসের উপর নিজের স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এর প্রকৃত গুরুত্ব মে'রাজের ধরনের মধ্যে নয় বরং মের'াজের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের মধ্যে নিহিত।

মূলকথা হলো, এই ভূগোলকের যেখানে আমরা বসবাস করি তা আল্লাহ তাআলার অসীম ও আজিমুশশান রাজত্বের একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র। এ প্রদেশে আল্লাহর তরফ থেকে নবী রাসূল পাঠান হয়েছে। তাঁর মর্যাদা কিছুটা এরূপ মনে করুন, যেমন দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিজের অধীনস্থ এলাকাসমূহে গভর্নর কিংবা ভাইসরয় পাঠিয়ে থাকে। এক দিক থেকে এ দুটোর মধ্যে বড় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। পার্থিব রাজ্যের গভর্নর ও ভাইসরয় শুধু শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হয়। আর বিশ্ব রাজত্বের গভর্নর এবং ভাইসরয় মানুষকে সঠিক পথ এবং কৃষ্টি, পবিত্র আখলাক, সত্য জ্ঞান ও আমলের সেই নব নীতিমালা শিখাবার জন্য নিয়োজিত হয়, যা আলোর মিনারের মতো মানব জীবনের রাজপথে দাঁড়িয়ে শত শত বছর পর্যন্ত সত্য সোজা পথ দেখাতে থাকে। কিন্তু এ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্যও আছে। দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো গভর্নরের মত দায়িত্বশীল পদ সেসব লোকের উপর অর্পণ করে, যারা হবেন তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করার পর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কিভাবে ও কি পলিসির উপর চলছে তা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের পূর্ণ সুযোগ তাদের দেয়া হয়। তাদের নিকট রাষ্ট্রের এমন কিছু গোপন কথাও প্রকাশ করা হয়, যা

সর্বসাধারণে প্রকাশ করা হয় না। আল্লাহর সালতানাতের অবস্থাও তাই। এখানে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে সেই ধরনের লোকই নিয়োগ করেছেন যারা ছিলেন সকলের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। আর তাঁদের এ পদে নিয়োগ করার পর আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁদেরকে তাঁর বাদশাহীর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়েছেন এবং দুনিয়ার ঐ সব রহস্য তাদের নিকট প্রকাশ করেছেন, যা সাধারণ লোকদের নিকট প্রকাশ করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আসমান ও যমিনের মালাকুত অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করানো হয়েছে[১] এবং তাও দেখানো হয়েছে চাক্ষুসভাবে যে আল্লাহ কিভাবে মৃতদের জীবনদান করেন।[২] হযরত মূসা (আ)-কে জালওয়ায়ে রব্বানী দেখানো হয়েছে এবং একজন বিশিষ্ট বান্দার সাথে কিছুদিন পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়ে নেয়া হয়েছে, যেন আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যেভাবে হয় তা দেখে ও বুঝে নেন।[৩] এ ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা রাসূলুল্লাহ (স) অর্জন করেছেন। কখনো তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের দিগন্তে স্পষ্টভাবে দেখেছেন।[৪] কখনো কখনো ঐ ফেরেশতা তাঁর নিকটবর্তী হতে এতটা নিকটে এসে যেতেন যে, তাঁর আর ফেরেশতার মধ্যে দু' এক গজ বরং তার চেয়েও কম দূরত্ব থাকতো। আবার কখনো ঐ ফেরেশতা নবী (স)-এর সাথে সিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ বস্তুজগতের শেষ সীমায় সাক্ষাত করতেন। সেখানে তিনি আল্লাহর আজিমুশশান নিদর্শনাদি দেখতেন।[৫] এ ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে মে'রাজও একটি। মে'রাজ শুধু সফর ও পর্যবেক্ষণের নামই নয়, বরং তা এমন পর্যায়ে সংঘটিত হয়, যখন নবীকে কোনো বিশেষ কাজে নিযুক্ত করার জন্য ডেকে নেয়া হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেয়া হয়। হযরত মূসা (আ)-এর মে'রাজ ছিলো যখন তাঁকে তুওয়ার পবিত্র উপত্যকায় ডেকে নিয়ে হুকুম করা হয়েছিল যে, মিসরে যাও, ফেরাউনকে সত্য পথের দাওয়াত দাও। এভাবে তাঁকে তূর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে বিখ্যাত দশটি নির্দেশনামা দিয়েছিলেন। এভাবে হযরত ঈসা

---

১. وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-(انعام)

২. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى-(البقرة)

৩. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا -(كهف)

৪. وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ -(تكوير)

৫. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى اِلٰى قَوْلِهٖ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -(نجم)

(আ)-এর মে'রাজ ছিলো যখন তিনি সারা রাত পাহাড়ে কাটিয়েছেন এবং সেখান থেকে উঠে বারজন রাসূল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছেন এবং ওয়াজ করেছেন যা পাহাড়ী ওয়াজ নামে খ্যাত। এভাবে রাসূলে করীম (স)-কে আল্লাহর দরবারে ডেকে নেয়া ছিলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এটা ছিলো সেই সময়, যখন মহানবী (স) তাঁর মিশনের তাবলীগ করে প্রায় বারটি বছর অতিবাহিত করেছেন। হেজাযের অধিকাংশ গোত্রে এবং নিকটবর্তী দেশ হাবশায় তাঁর মিশনের দাওয়াত পৌঁছে গেছে। তাঁর আন্দোলনও এক পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে গিয়ে পদার্পণ করেছিলো। দ্বিতীয় পর্যায় বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে, তখন মক্কার এ প্রতিকূল পরিবেশ ছেড়ে মদীনার দিকে যাবার সময় হয়ে এসেছিলো, যেখানে তাঁর সাফল্যের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিলো। এ দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর মিশন বেশ বিস্তৃত হওয়ার পর্যায়ে ছিলো। শুধু হেজায ও আরব দেশই নয় বরং আশেপাশের অন্যান্য গোত্রের সাথেও পরিচিতি ও বন্ধুত্ব হতে যাচ্ছিলো। ইসলামী আন্দোলন একটি কল্যাণরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবার পথে চলছিলো। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিয়োগের একটি পরওয়ানা ও নতুন হেদায়াত প্রদানের জন্য বিশ্বজাহানের মালিক মহানবী (স)-কে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন। এ উপস্থিতির নামই মে'রাজ। উর্ধ্বলোকের এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণ হিজরতের আনুমানিক এক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। এ ভ্রমণকালের ঘটনাবলী হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যেমন বায়তুল মাকদিস পৌঁছে নামায আদায় করা, আসমানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা, অতীতের নবী-রাসূলের সাথে সাক্ষাত এবং পরে শেষ মঞ্জিলে এসে পৌঁছোনো। কিন্তু কুরআন মজীদ সবসময় আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে মূল উদ্দেশ্য পর্যন্ত নিজের বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখে। তাই কুরআনে মে'রাজের ধরন সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না করে বরং সেই বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডেকে নেয়া হয়েছিলো। কুরআনের ১৭শ সূরায় আপনি এ বর্ণনা পাবেন। এর দুটো অংশ। এক অংশে মক্কার লোকদেরকে শেষ নোটিস দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের নির্যাতনের কারণে যদি আল্লাহর নবী দেশ ত্যাগে বাধ্য হন তাহলে মক্কায় তোমরা কয়েক বছরের বেশী অবস্থানের সুযোগ পাবে না।[১] বনী ইসরাঈলকেও যাদের সাথে অচিরেই মদীনায় মহানবী (স)-এর সরাসরি মুখোমুখি হবার ছিলো, হুশিয়ার করে দেয়া হলো যে, তোমাদের

---

১. وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا
—(بنى اسرائيل)

ইতিহাসে তোমরা দু' দু'বার ধাক্কা খেয়েছো এবং দু'টি মূল্যবান সুযোগ নষ্ট করেছো। এখন তোমরা তৃতীয় সুযোগ পাবে। আর এটাই শেষ সুযোগ।[২]

দ্বিতীয় অংশে সেইসব বুনিয়াদী নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে মানবীয় তামাদ্দুন ও আখলাক গড়ে উঠা উচিত। আর এ নীতিমালা চৌদ্দটি।

(১) শুধু আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

(২) সমাজ সভ্যতায় পরিবারকে গুরুত্ব দিতে হবে। পিতামাতাকে সম্মান এবং তাদের আনুগত্য করতে হবে, আত্মীয়-স্বজন পরস্পরের সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে।

(৩) সমাজের গরীব অক্ষম ব্যক্তিগণ অথবা যেসব লোক দেশের বাইরে সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যাবে না।

(৪) ধন-সম্পদের অপচয় করা যাবে না। যে ধনী ব্যক্তি নিজের ধন সম্পদ খারাপ পথে খরচ করে সে শয়তানের ভাই।

(৫) মানুষকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কৃপণতা করে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা যাবে না। আবার অতিরিক্ত খরচ করেও নিজের ও অন্যদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না।

(৬) রিযিক বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন, মানুষ তার মধ্যে নিজেদের কৃত্রিম পন্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। আল্লাহ পাক নিজের ব্যবস্থাপনার সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

(৭) আর্থিক অনটনের ভয়ে লোকেরা নিজেদের বংশবৃদ্ধির পথ বন্ধ করবে না। বর্তমান বংশধরদের রিযিকের ব্যবস্থা যেভাবে আল্লাহ করেছেন, অনাগতদের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি এভাবে করবেন।

(৮) কুপ্রবৃত্তির লালসা পূরণের জন্য ব্যভিচারের মত নোংরা কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। শুধু ব্যভিচার থেকে বিরতই থাকবে না বরং তাতে প্রলুব্ধকারী উপায় উপকরণের পথও বন্ধ করে দিতে হবে।

---

২. وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيلَ اِلى قول رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ

(৯) মানবজীবনের মূল্য ও মর্যাদা আল্লাহ পাক দান করেছেন। কাজেই আল্লাহর নির্ধারিত আইন ছাড়া অন্য কোনো কারণে মানুষের রক্তপাত করা যাবে না। আত্মহত্যা করবে না, অন্যকে হত্যা করবে না।

(১০) ইয়াতীমের সম্পদের হেফাজত করতে হবে, যতদিন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। তাদের অধিকার বিনষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

(১১) কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকার পালন করে চলতে হবে। চুক্তি ও অঙ্গীকারের জন্য মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

(১২) ব্যবসা-বাণিজ্যে সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে হবে। ওজন ও পরিমাপ সঠিক রাখতে হবে।

(১৩) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করবে না। আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে চলবে না, গুজব ছড়াবে না, গুজবে কান দেবে না। মানুষ তার সার্বিক শক্তি কি কাজে ব্যবহার করেছে, এ ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে।

(১৪) গর্ব ও অহংকার থেকে দূরে থাক। তোমার অহংকারী চলন না যমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না তুমি পাহাড়ের চেয়ে উঁচু হতে পারবে।

এ চৌদ্দটি নীতিমালা মে'রাজের রাতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে দান করেছেন। এগুলো শুধু নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না। মূলত এগুলো ছিল ইসলামের মেনিফেস্টো বা ঘোষণাপত্র, যার ভিত্তিতে মহানবী (স)-কে ভবিষ্যতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ হেদায়াতগুলো সেই সময়ে দেয়া হয়েছিল, যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আন্দোলন প্রচারের স্তর অতিক্রম করে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের স্তরে পদার্পণ করেছিলেন। তাই সেই যুগ শুরুর আগে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল কোন্ কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। এ কারণে মে'রাজ উপলক্ষে এ চৌদ্দ দফা নির্ধারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ইসলামের অনুসারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।[১] এর উদ্দেশ্য হলো যারা এ কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য অগ্রসর হবেন, তাদের মধ্যে যেন নৈতিক কাঠামো

---

১. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ(بنى اسرائيل)

গড়ে উঠে আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে যেন অমনোযোগী না হয়ে পড়ে। প্রতিদিন পাঁচ বেলা তাদের মনে উদিত হতে থাকবে যে, তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। বরং তাদের একজন বড় হাকিম আছেন তিনি আল্লাহ্। তাঁর নিকট তাদের সকল কাজের হিসাব দিতে হবে।

-(২০ আগস্ট, ১৯৪১ ইং)

মে'রাজের পয়গাম

ইসলামের ইতিহাসে দুটি রাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হলো, যে রাতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর কুরআন মজীদ নাযিল করা শুরু হয়েছিলো। আর দ্বিতীয়টি হলো, যে রাতে মহানবী (স)-এর মে'রাজের সৌভাগ্য হয়েছিলো। প্রথম রাতের গুরুত্বতো সকলেরই জানা যে, মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য ঐ রাতে হেদায়াতের সেই আলোকরশ্মি পাঠানো হয়েছিলো, যা বাতিলের অন্ধকারের মধ্যে শত শত বছর পর্যন্ত সত্যের আলো ছড়িয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ছড়াতে থাকবে। কিন্তু দ্বিতীয় রাতের গুরুত্ব কিছু ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে হারিয়ে গেছে। খুব অল্পসংখ্যক লোকই জানেন যে, ঐ রাতে মানব সমাজ গঠনের কত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়েছে। আজ এ পবিত্র রাতটির স্মৃতি তাজা করতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে, এ রাত আমাদের জন্য কি পয়গাম বহন করে এনেছে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় জানা যায় যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। এ সময় রাসূলে করীম (স)-এর তাওহীদের ঝাণ্ডা বহন করে চলার বার বছর অতিক্রান্ত হয়েছিলো। ইসলামের শত্রুরা তাঁর পথ রুখবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াত আরবের প্রান্তরে প্রান্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু' চারজন অনুসারী পাওয়া যেতো না, এমন কোনো গোত্র তখন আরবে অবশিষ্ট ছিলো না। স্বয়ং মক্কায় এমন নিষ্ঠাবান লোকের ছোট দল তাঁর চারদিকে জমা হয়ে গিয়েছিল, যাদের চেয়ে অধিক কর্মতৎপর ও নিবেদিত প্রাণ সহযোগী দুনিয়ার আর কোনো আন্দোলন লাভ করতে পারেনি। মদীনার দুটো শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা গোত্রের প্রায় অধিকাংশ লোকই রাসূলে করীম (স)-এর দাওয়াতে ঈমান এনেছিলো। মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়া এবং গোটা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের এক জায়গায় একত্রিত করে এতকাল যাবত তাঁর প্রচারিত নীতিমালার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র কায়েম করার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল। ঠিক সে সময়েই মে'রাজে যাওয়ার ঘটনা সংঘটিত হলো।

এ সফর হতে ফিরে এসে যে পয়গাম তিনি দিলেন, তা কুরআন মজীদের ১৭শ সূরা বনী ইসরাঈলে আজ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত আছে।

এ সূরাটি দেখুন আর এর ঐতিহাসিক পটভূমি দৃষ্টির সামনে রাখুন, তাহলে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, ইসলামী নীতিমালার উপর একটি নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পূর্বক্ষণে সেইসব হেদায়াত দেয়া হচ্ছিলো, যার উপর রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীদের ভবিষ্যতে কাজ করতে হবে।

এ বাণীতে মে'রাজের উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈলী ইতিহাসের শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। মিসরবাসীদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে এসে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বাধীন জীবন শুরু করেছিলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আসমানী কিতাব দান করলেন এবং তাকিদ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের বিষয়াদি সমাধান করার ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কারো হাতে সোপর্দ করো না। কিন্তু বনী ইসরাঈল আল্লাহর এ নেয়ামতের শোকর আদায় করার পরিবর্তে কুফরী করলো এবং পৃথিবীর বুকে শান্তি স্থাপনকারী হওয়ার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টিকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ফলে আল্লাহ তাআলা একবার বাবেলবাসীদের দ্বারা তাদের পদদলিত করালেন এবং দ্বিতীয়বার রোমান জাতিকে তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন। এ শিক্ষাপ্রদ ইতিহাসের উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, শুধু কুরআনই সেই জিনিস যা তোমাদের ঠিক পথ বলে দিবে। একে অনুসরণ করে কাজ করলে তোমাদের জন্য মহান পুরস্কারের শুভ সংবাদ আছে।

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলো, প্রত্যেক মানুষ স্বয়ং নিজের একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্বানুভূতি রাখে। তার নিজের কার্যক্রম তার ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী বিষয়। সোজাপথে চললে নিজের কল্যাণ হবে, ভ্রান্তপথে চললে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যে কেউ কারো শরীক নয়, আর না একজনের বোঝা আর একজনের উপর পতিত হতে পারে। অতএব একটি কল্যাণকর সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যে যা কিছুই করুক, তাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে সে নিজে কি করছে।

তৃতীয় যে কথাটি সতর্ক করা হয়েছে তাহলো একটি সমাজকে অবশেষে যে জিনিস ধ্বংস করে তাহলো তাদের প্রভাবশালী লোকদের পথভ্রষ্টতা। যখনই কোনো জাতির ভাগ্যবান, সম্পদশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, যুলুম-নির্যাতন, দুষ্কৃতি ও দুরাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই তাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং অবশেষে এ

বিপর্যয় গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব যে সমাজ নিজেই নিজের শত্রু নয় তাকে চিন্তা করতে হবে যে, তার এখানে।

তারপর মুসলমানদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা কুরআনে বার বার বলা হয়েছে যে, যদি এ দুনিয়া এবং পার্থিব উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দই কেবলই তোমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে এসব কিছু তোমরা লাভ করতে পার। কিন্তু এর শেষ পরিণতি খুবই খারাপ। আখিরাতের চিন্তা ও সেখানে জবাবদিহির কথা মনে রেখে তোমাদের সকল কাজ আঞ্জাম দিলে দুনিয়া ও আখিরাতের চিরস্থায়ী শান্তি ও কামিয়াবী পেতে পারো, যাতে ব্যর্থতার ছায়া পড়বে না। দুনিয়াপূজারীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ দৃশ্যত গঠনমূলক নির্মাণ মনে হলেও তার মধ্যে একটি বড় অনিষ্ট নিহিত আছে। তারা চরিত্রের সেই মহিমা থেকে বঞ্চিত থাকে যা শুধু আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি হতে সৃষ্টি হয়। তোমরা দুনিয়াতেই এ দু' ধরনের মানুষের মধ্যে এ পার্থক্য দেখতে পারো। এ পার্থক্য জীবনের পরবর্তী সোপানগুলোতে আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠবে। এমন কি একজনের জীবন সম্পূর্ণ বিফল এবং অন্যজনের জীবন সম্পূর্ণ সফল হয়ে থাকে।

ভূমিকা স্বরূপ এসব নসীহতের পর সেই সব গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে ভবিষ্যত ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে হবে। তা হলো, চৌদ্দ দফা নীতিমালা। এ দফাগুলোতে মেরাজের এই পয়গামে বর্ণিত ক্রমানুযায়ী আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব—

(১) এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভূত্ব মানা যাবে না। শুধু তিনিই তোমাদের মাবুদ, তোমরা শুধু তারই ইবাদাত বন্দেগী কর। তাঁর হুকুমের আনুগত্য করাই তোমাদের কাজ। তিনি ছাড়া যদি আর কারো সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার কর, চাই সে অন্য কেউ হোক অথবা তোমাদের নিজেদের প্রকৃতি বা নফস, শেষ পর্যন্ত তুমি ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হবে এবং সেই বরকত থেকে বঞ্চিত হবে, যা শুধু আল্লাহর সাহায্যেই হাসিল হয়ে থাকে।[১]

(২) মানবীয় অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বপ্রথম অধিকার হলো, মাতা-পিতার। সন্তানদেরকে মাতা-পিতার অনুগত, সেবক ও শিষ্ট

১. এটা শুধু একটি ধর্মীয় আকিদাই ছিল না বরং সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থারও সর্বপ্রথম ও বুনিয়াদী নীতিও ছিল, যা কিছুদিন পর তিনি মদীনায় পৌছে কায়েম করেছিলেন। তার গোটা ইমারাত এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল যে, আল্লাহই বিশ্বের মালিক ও বাদশাহ এবং আল্লাহর শরীআতই দেশের আইন বিধান।

হতে হবে। সমাজের সামষ্টিক চরিত্র এমন হওয়া উচিত, যেখানে সন্তান মাতা-পিতার প্রতি বিমুখ ও বিদ্রোহী হবে না বরং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের বার্ধক্যে তাদের প্রতিপালন ও দেখাশুনা এমনভাবে করবে—যেমন তাঁরা তাদের শিশুকালে করেছিলো।[২]

(৩) সমাজের সামগ্রিক জীবনে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও অধিকার দেয়া-নেয়ার পরিবেশ জারী থাকবে। প্রতিটি আত্মীয়স্বজন অপরজনের সাহায্যকারী হবে। প্রতিটি অভাবী মানুষ অন্য মানুষের সাহায্য পাবার হকদার। কোনো মুসাফির যে জনপদেই যাবে, সে নিজকে অতিথিপরায়ণ লোকদের মধ্যে পাবে। সমাজে অধিকারের ধারণা এত বিস্তৃত যে, প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের ঐসব মানুষের অধিকার আছে বলে অনুভব করে, যাদের মধ্যে সে বাস করে। তাদের যদি কোনো সেবা করে তাহলে মনে করে যে, সে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করছে, তাদের উপর অনুকম্পার বোঝা নিক্ষেপ করছে না। আর যদি কোনো সেবা দানের উপযুক্ত না হয়, তাহলে অপারগতা প্রকাশ করে এবং আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, যাতে অন্যের কোনো কাজে আসতে পারে।[৩]

---

২. এ দফার আলোকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হবে পরিবার। আর পারিবারিক পরিবেশটা হবে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও মর্যাদাবোধ ভিত্তিক। অতপর এ দফার উদ্দেশ্য অনুযায়ী মাতা-পিতার শরীআত সম্মত অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফিক্‌হ-এর গ্রন্থাবলীতে পাই। এ ছাড়াও ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের মধ্যে এসব চিন্তাধারা গেঁথে দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ ও রাসূলের পরে মাতাপিতাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়। এসব জিনিস সর্বকালের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র তার আইন কানুন ও ব্যবস্থাপনাগত বিধানের মাধ্যমে পরিবারকে দুর্বল করার পরিবর্তে আরো মযবুত ও সুরক্ষিত করার চেষ্টা করবে।

৩. এ দফার ভিত্তিতে মদীনার সমাজে সদকায়ে ওয়াজিবা (যাকাত) ও সদকায়ে নাফেলার (দান খয়রাত) বিধান দেয়া হয়েছে। অসিয়ত, উত্তরাধিকারিত্ব ও ওয়াক্‌ফের নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইয়াতীমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি জনপদে মুসাফিরের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, অন্তত তিন দিন পর্যন্ত তার মেহমানদারী করতে হবে। অতপর নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে গোটা সমাজে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার এমন প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আইনসঙ্গত অধিকার ছাড়াও নৈতিক অধিকারের এক ব্যাপক ধারণার সৃষ্টি হয়। আর এর ভিত্তিতে মানুষ স্বয়ং একে অপরের এমন সব অধিকারও পৌছে দেয়, যা কোনো আইনের মাধ্যমে দাবী করা যেতো না এবং আদায় করে দেয়াও যেতো না।

(৪) মানুষ তার ধন-সম্পদ কোনো ভুল পথে যেনো ব্যয় না করে। বাহাদুরী, লোক দেখানো ও প্রদর্শনেচ্ছু খরচ, বিলাসিতা ও পাপের পথে খরচ নিন্দিত ও গর্হিত। মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন ও কল্যাণকর কাজে খরচ হবার পরিবর্তে ঐসব উৎসে সম্পদকে ব্যয় করলে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করার শামিল । যারা এভাবে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই। একটি মার্জিত সমাজের দায়িত্ব হলো সম্পদের এ অপব্যবহারকে নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আইনানুগ বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রতিহত করা।

(৫) মানুষের মধ্যে এতটা ভারসাম্য থাকা দরকার যে, সে কৃপণ সেজে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে না এবং বেহুদা খরচ করেও নিজের আর্থিক শক্তি ধ্বংস করে দেবে না। সমাজের মানুষগুলোর মধ্যে ভারসাম্যতার এমন এক সঠিক উপলব্ধি থাকতে হবে যে, যথাযথ খরচ থেকে সে বিরতও থাকবে না আবার অসংগত খরচের অনিষ্টতায়ও লিপ্ত হবে না।[৪]

(৬) আল্লাহ তাআলা তাঁর রিযিক বন্টনের যে ব্যবস্থা কায়েম করেছেন, মানুষ কৃত্রিম উপায়ে যেন এতে হস্তক্ষেপ না করে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সকলকে এক সমান রিযিক দান করেননি বরং তাদের মধ্যে তারতম্য করেছেন। এর মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে যা তিনি স্বয়ং সবচেয়ে বেশী ভাল জানেন। অতএব একটা সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাই, যা আল্লাহর নির্ধারিত পন্থার নিকটতর হবে। প্রাকৃতিক অসাম্যকে একটি

---

৪. মদীনার সমাজে এ দুটি দফার উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন পন্থায় করা হয়েছে। একদিকে আইনের মাধ্যমে অপব্যয় ও বিলাসিতার অনেক পথ হারাম করে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে আইনগত পদক্ষেপের মাধ্যমেও সম্পদের অপব্যয় প্রতিরোধ করা হয়েছিলো। তৃতীয়ত রাষ্ট্রকে এ অধিকার দেয়া হয়েছিলো যে, অপব্যয়ের সুস্পষ্ট পন্থাগুলোকে সে প্রশাসনিক বিধানের মাধ্যমে বন্ধ করে দেবে। আর যেসব লোক নিজের সম্পদে খুব বেশী নাজায়েয পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে তাদের সম্পদকে সাময়িকভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। এসব ছাড়াও সমাজের এমন একটি জনমতও গড়ে উঠে যা বাজে খরচের ক্ষেত্রে হাততালি দেয়ার পরিবর্তে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যেন সে সঠিক ও অযথা খরচের মধ্যে ব্যবধান বুঝতে পারে এবং অযথা খরচ থেকে নিজেই বিরত থাকে। এভাবে কৃপণ ব্যক্তিকেও আইনের মাধ্যমে যতটুকু ঠিক করা সম্ভব সেখানে আইনের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট সংশোধনের কাজ হয়েছে জনমত ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে। এর প্রভাবেই আজ মুসলিম সমাজে কৃপণ ও ধনকুবেরদেরকে যেভাবে ঘৃণার চোখে দেখা হয়, তার উদাহরণ অন্য কোনো সমাজে পাওয়া যাবে না।

কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তন করা অথবা অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমা থেকে বর্ধিত করে বেইনসাফীর সীমায় পৌছিয়ে দেয়া দুটোই এক সমান ভুল।[৫]

(৭) বংশবৃদ্ধি এ ভয়ে বন্ধ করে দেয়া একটা মারত্মক ভ্রান্তি যে, খাবার লোক বেড়ে গেলে আর্থিক উপায় উপকরণ কমে যাবে। যারা এ ভয়ে ভবিষ্যত বংশধরদের ধ্বংস করে তারা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, রিযিকের ব্যবস্থার ভার তাদের হাতে। অথচ রিযিকদাতা হলেন সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি মানবজাতিকে পৃথিবীতে বসিয়েছেন। আগে যারা এসেছে তাদের রিযিকের সংস্থানও তিনি করে দিয়েছেন। আর পরে যারা আসবে তাদের রিযিকের সংস্থানও তিনিই করে দেবেন। জনবসতি যতই বৃদ্ধি পায় তদনুযায়ী আল্লাহ তাআলা জীবন জীবিকার উপায় উপকরণও প্রশস্ত করেন। তাই মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থায় যেনো অযথা হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করে এবং কোনো অবস্থায়ও তাদের মধ্যে যেন বংশরোধের প্রবণতা সৃষ্টি হতে না পারে।[৬]

(৮) যেনা ব্যভিচার নারী পুরুষের সম্মিলনের একটা সম্পূর্ণ মারাত্মক ভুল প্রক্রিয়া, এটা শুধু বন্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং সমাজে সেসব উপায় উপকরণও বন্ধ করে দিতে হবে, যা মানুষকে যেনার দিকে আকৃষ্ট করে।[৭]

---

৫. এ দফায় প্রাকৃতিক বিধানের যে নীতিমালার প্রতি পথনির্দেশ করা হয়েছিলো তার কারণেই মদীনার সংস্কার কর্মসূচীতে এ চিন্তা কোনো অবস্থাতেই স্থান পায়নি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায় উপকরণের মধ্যে ব্যবধান স্বয়ং কোনো বেইনসাফী এবং ইনসাফ কায়েমের জন্য ধনী-গরীবের পার্থক্য মিটিয়ে ফেলা এবং শ্রেণীহীন একটা সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা করা কোন্ অবস্থায় ইঙ্গিত। পক্ষান্তরে মদীনা তাইয়েবায় মানবীয় সংস্কৃতিকে সঠিক ভিত্তির উপর কায়েম করার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছিলো তা এই ছিলো যে, আল্লাহর ফিতরাত মানুষের যে ব্যবধান রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় বহাল রেখে ৩, ৪, ৫নং দফা অনুযায়ী সমাজের চরিত্র, প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন কানুনকে এভাবে সংশোধন করতে হবে যে, অর্থনৈতিক পার্থক্য ও ব্যবধান কোনো যুলুম বা বেইনসাফীর কারণ হবার পরিবর্তে ঐ অসংখ্য নৈতিক, রূহানী ও তামাদ্দুনিক ফায়দার উপায় হিসেবে পরিগণিত হবে, যার জন্য প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান রেখে দিয়েছেন।

৬. এ দফাটি সেই সব অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ভেঙেচুরে চুরমার করে দেয়, যার উপর ভিত্তি করে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন উত্থিত হতে থাকে। প্রাচীনকালে গরীব হয়ে যাবার আশংকায় 'সন্তান হত্যা' ও 'গর্ভপাত' উত্তেজক শক্তি হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। আর আজ তা একটি তৃতীয় আন্দোলন অর্থাৎ 'গর্ভনিরোধ' এর দিকে দুনিয়াকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু মে'রাজের পয়গামের এই দফা মানুষকে খাবার লোকের সংখ্যা হ্রাস করার মত ধ্বংসাত্মক কাজ ছেড়ে দিয়ে খাদ্য উৎপাদনের উপায়-উপকরণ বাড়াবার মত গঠনমূলক কাজে তার শক্তি ও যোগ্যতা ব্যয় করতে হেদায়াত দিচ্ছে।

৭. এ দফাটি অবশেষে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি ব্যাপক অধ্যায়ের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী যেনা ও যেনার অপরাধকে ফৌজদারী অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পর্দার বিধান জারি করা হয়েছে। অশ্লীলতার প্রচারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মদ-জুয়া, সংগীত, নাচগান ও চলচ্চিত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এমন একটা দাম্পত্য বিধান রচনা করা হয়েছে, যার ফলে বিবাহ করা সহজ হয়ে গেছে আর যেনা ব্যভিচারের সামাজিক উপায় উপকরণ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(৯) মানুষের জীবনকে আল্লাহ পাক সম্মানযোগ্য ঘোষণা করেছেন। কোনো ব্যক্তি না নিজে আত্মহত্যা করতে পারে, আর না কাউকে হত্যা করতে পারে। আল্লাহর নির্ধারিত এই মর্যাদা শুধু তখনই রহিত হতে পারে যখন তারই নির্ধারিত অন্য কোনো অধিকার তার বিরুদ্ধে কায়েম হয়ে যায়। আবার অধিকার (হক) কায়েম হয়ে যাবার পরও রক্তপাত শুধু সেই সীমা পর্যন্ত হতে পারে, যতদূর পর্যন্ত হকের দাবী থাকে। হত্যার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ীর সমস্ত পথ বন্ধ হওয়া উচিত। যেমন প্রতিশোধের স্পৃহায় অপরাধী ছাড়াও নিরপরাধ লোকজন হত্যা করা, অথবা অপরাধীকে শাস্তি দিতে দিতে মারা অথবা মৃত্যুর পর লাশকে অপদস্ত করা, অথবা এ ধরনের অন্যান্য প্রতিশোধমূলক বাড়াবাড়ী করা যা দুনিয়াতে প্রচলিত আছে।[৮]

(১০) ইয়াতীমের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যতদিন পর্যন্ত সে নিজের ভালোমন্দ বুঝতে সক্ষম না হবে। তার ধন-সম্পদ এমনভাবে ভোগ ব্যবহার হতে পারবে না, যা তার স্বার্থের জন্য কল্যাণকর নয়।[৯]

(১১) ওয়াদা ও চুক্তি, চাই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে করুক অথবা একটি জাতি অন্য জাতির সাথে করুক, সর্বাবস্থায় পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে পালন করতে হবে। চুক্তির পরিপন্থী আচরণের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।[১০]

---

৮. এ দফার ভিত্তিতে ইসলামী আইনে আত্মহত্যা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত হত্যাকে অপরাধ গণ্য করা হয়েছে, ভুলবশত হত্যার বিভিন্ন পন্থার জন্য রক্তপণ এবং কাফ্ফারার (জরিমানা) প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আর 'কতল বিল হক'-কে মাত্র তিনটি অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

এক ঃ কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী হলে।

দুই ঃ কোনো বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে।

তিন ঃ কোনো লোক ইসলামী সরকার ও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে। এরপরও 'কতল বিল হকে'র ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা শরীআতের বিচারককে দেয়া হয়েছে এবং এর একটি সুন্দর বিধিমালা প্রণয়ন করে দেয়া হয়েছে।

৯. এটা শুধু একটি নৈতিক হেদায়াতই ছিলো না বরং ইয়াতিমদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনগত ও ব্যবস্থাগত উভয় ধরনের পদক্ষেপই অবলম্বন করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা হাদীস ও ফিক্হ এর কিতাবে দেখতে পাই। তারপর এই দফা হতেই এই বিস্তারিত নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র তার সেই সকল নাগরিকের স্বার্থের সংরক্ষক যারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে অক্ষম। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, যার কোনো অভিভাবক নেই, আমি তার অভিভাবক। এটা ঐ কথার দিকেই ইঙ্গিত দেয় এবং এটা ইসলামী কানুনের একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভিত্তি।

১০. এটা শুধু ইসলামী নৈতিকতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিলো না, বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী হুকুমাত এটাকেই নিজের ও স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিপ্রস্তর সাব্যস্ত করেছিলো।

(১২) ওজন ও পরিমাপ ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে এবং লেন-দেনের ব্যাপারে সঠিক ওজন দিতে হবে।[১১]

(১৩) তোমরা এমন কোনো বিষয়ের পেছনে লেগে যেও না, যার সঠিক হবার বিষয়ে তুমি কিছু জান না। নিজের দর্শনশক্তি এবং মনের নিয়ত ও ধারণা এবং ইচ্ছার ব্যাপারেও তোমাকে আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে।[১২]

(১৪) যমীনের বুকে স্বৈরাচারী ও অহংকারী চালে চলো না। তুমি তোমার অহংকার দ্বারা না যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে আর না গর্বভরে পাহাড় হতেও উঁচু হয়ে যেতে পারবে।[১৩]

এই ছিলো সেই নীতিমালা যার উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় পৌঁছার পর ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।

–৫ জুন, ১৯৪৮ইং

---

১১. এই দফা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের হিসাব বিভাগের উপর অন্যান্য কর্তব্যের সাথে আরেকটি কর্তব্য আরোপিত হয়েছে যে, বড় বড় বাজারে ওজন ও পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং ওজনে ফাঁকিবাজি শক্তি প্রয়োগে বন্ধ করবে। আবার এখন থেকে বিস্তারিত নীতিমালা উদঘাটন করা হয়েছে যে, ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেন-দেনের ব্যাপারে সর্বপ্রকারের বেঈমানী হক বিনষ্ট হওয়ার পথ বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

১২. এই দফার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, মুসলিমগণ তার ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে আন্দাজ অনুমানের পরিবর্তে ইলমের অনুসরণ করবে। নৈতিকতায়, আইন-কানুনে, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়, রাজ নীতিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে এ দাবীর ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে এবং অসংখ্য দোষ-ত্রুটি হতে ইসলামী সমাজকে রক্ষা করা হয়েছে যা ইলমের পরিবর্তে আন্দাজ অনুমানের অনুসরণ করলে জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ পেতো। নৈতিকতার ক্ষেত্রে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, খারাপ ধারণা হতে বেঁচে থেকে এবং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ছাড়া কোনো অভিযোগ এনো না। আইনের ক্ষেত্রে এ স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ নিরূপণে এ নিয়ম ঠিক করে দেয়া হয়েছে যে, আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করা, মারপিট করা অথবা হাজতে প্রেরণ করা একেবারেই নাজায়েয। অমুসলিমদের সাথে আচার আচরণের এই পলিসি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না, আর সন্দেহের ভিত্তিতে গুজব ছড়ানো যাবে না। শিক্ষাব্যবস্থায় ঐসব নাম সর্বস্ব ইলমকে অপছন্দ করা হয়েছে, যা শুধু ধারণা, অনুমান ও অর্থহীন কিয়ামের উপর ভিত্তিশীল এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি বাস্তবপ্রিয় মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৩. এটাও শুধু ওয়াযের কথার মতো কোনো কথা ছিলো না বরং প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদেরকে আগাম সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, শাসন হাতে এলে যেন তারা গর্ব ও অহংকারে ডুবে না যায়। এটা সেই হেদায়াতের কল্যাণই ছিলো যে, মদিনা তাইয়েবায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছিলো তার রাষ্ট্রপ্রধানগণ গভর্নর ও সিপাহসালারদের মুখে অথবা লেখনীতে এ ধরনের এমন একটি বাক্যও আজ পর্যন্ত আমরা পাই না যাতে গর্ব ও অহংকারের সামান্যতমও গন্ধ পাওয়া যায়। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও তারা কখনো এ ধরনের কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা, অহংকারপূর্ণ বাক্য মুখ দিয়ে বের করেননি। তাদের কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়া, বরখাস্ত হওয়া, চাল-চলন, সাধারণ আচরণ তথা প্রতিটি জিনিসেই অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার ভাব ফুটে উঠতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোনো দেশে প্রবেশ করতেন, তখন তারা ঔদ্ধত্য, অহংকার ও গর্ব প্রদর্শন করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করার চেষ্টা করতেন না।

মে'রাজের সফর

ইসলামের নবীর জীবনে মে'রাজ সেসব ঘটনার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বিশ্বে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনা হিজরতের আনুমানিক এক বছর আগে ২৭শে রজবের রাতে সংঘটিত হয়েছিলো। কুরআন পাকেও এ ঘটনার উল্লেখ হয়েছে, হাদীস শরীফেও মে'রাজ কি কারণে হয়েছিলো এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ডেকে নিয়ে কি হেদায়াত দিয়েছিলেন তা কুরআন বলে দিয়েছে। মে'রাজ কিভাবে হলো আর এ সফরে কি ঘটেছিলো তা হাদীসে বলা হয়েছে।

মে'রাজের বিস্তারিত বিবরণ সমসাময়িক কালের ২৮ জন রাবীর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৭জন বর্ণনাকারী স্বয়ং মে'রাজের যুগে বর্তমান ছিলেন, আর ২১জন বর্ণনাকারী এমন ছিলেন, যারা পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জবান মুবারকে মে'রাজের ঘটনা শুনেছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা ও ঘটনার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে সবগুলো মিলালে এমন একটা সফরনামার বিবরণ তৈরী হয়, যার চেয়ে অধিক হৃদয়গ্রাহী, অর্থবহ ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী সফরনামা মানব সাহিত্যের ইতিহাসে আর একটিও পাওয়া যায় না।

হযরত মুহাম্মাদ (স) রিসালাতপ্রাপ্ত হয়েছেন বার বছর হয়েছে। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৫২ বছর। কা'বার হারাম শরীফে শুয়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হযরত জিবরীল (আ) এসে তাঁকে জাগালেন। আধাঘুম আধা জাগা অবস্থায় তাঁকে জমজম কূপের নিকট নিয়ে গেলেন। সিনা সাক (বক্ষ বিদারণ) করালেন। জমজমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে নিলেন। তারপর তা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সহিষ্ণুতা, ঈমান ও ইয়াকীনে ভরে দিলেন। এরপর তাঁর আরোহণের জন্য একটি জানোয়ার পেশ করা হলো। জানোয়ারের রং ছিলো সাদা। আকারে খচ্চরের চেয়ে কিছু ছোট ছিলো। বুরক বা বিজলির গতিতে চলতো। এ সাদৃশ্যের কারণেই এর নাম 'বুরাক' দেয়া হয়েছিলো। আগের নবীগণও এ ধরনের সফরে এ সওয়ারীর উপর আরোহণ করেই গিয়েছিলেন। তিনি যখন আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন তা চমকে উঠেছিলো। জিবরীল (আ) তখন ধমক দিয়ে বললেন, দেখো, তুমি কি করছো! আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (স)-এর মত কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষ তোমার পিঠে আরোহণ করেনি। এরপর তিনি এর উপর আরোহণ করলেন। জিবরীল (আ)-ও তাঁর সাথে চললেন। প্রথম মঞ্জিল ছিলো

'মদীনা'। এখানে অবতরণ করে তিনি নামায পড়লেন। জিবরীল (আ) বললেন, এখানে আপনি হিজরত করে আসবেন। দ্বিতীয় মঞ্জিল 'তুরে সিনা' (সিনাই উপত্যকা)। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন হলো। তৃতীয় মঞ্জিল ছিলো বায়তে লাহম (বেথেলহাম)। এখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ মঞ্জিল ছিলো বায়তুল মাকদিস। এখানে বুরাকের সফর শেষ হলো।

এ সফর চলাকালে এক জায়গায় কোনো আহবানকারী আহবান করে বললো এদিকে এসো। তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। জিবরীল (আ) বললেন, এ আপনাকে ইহুদীবাদের দিকে আহবান করছিলো। আর একদিক থেকে আওয়াজ এলো, এদিকে এসো। তিনি সেদিকও লক্ষ্য করলেন না। জিবরীল (আ) বললেন, সে আপনাকে ঈসাইয়াতের দিকে আহবান করছিলো। এরপর একটি খুব সাজগোজ করা নারী নজরে পড়লো। সেও নিজের দিকে আহবান জানালো, তিনি তার দিকেও ফিরে তাকালেন না। জিবরীল (আ) বললেন, এ ছিলো পার্থিব জগত। এরপর একটি বৃদ্ধা নারী সামনে এলো। জিবরীল (আ) বললেন, দুনিয়ার বয়স এর থেকে অনুমান করে নিন। এরপর আরো একটি লোক এলো, এ লোকটিও তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলো। কিন্তু রাসূলে করীম (স) তাকেও অতিক্রম করে আগে অগ্রসর হলেন। জিবরীল (আ) বললেন, এটি ছিলো শয়তান। এর অভিপ্রায় ছিলো আপনাকে বিপথগামী করা।

বায়তুল মাকদিস পৌঁছে তিনি বুরাক থেকে নেমে গেলেন। এখানে তিনি সেই জায়গায় বুরাক বাঁধলেন যেখানে অন্যান্য নবীগণও বাঁধতেন। হায়কালে সুলায়মানীতে প্রবেশ করলে সৃষ্টির শুরু থেকে আরম্ভ করে ওই সময় পর্যন্ত যত নবী দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলকে এখানে উপস্থিত পেলেন। তিনি এখানে পৌছা মাত্রই নামাযের কাতার দাঁড়িয়ে গেলো। ইমামতি করার জন্য কে আগে অগ্রসর হবেন, সকলে এই অপেক্ষায় ছিলেন। জিবরীল (আ) হাত ধরে তাঁকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি ইমামতি করলেন। অতপর তাঁর সামনে তিনটি পেয়ালা পেশ করা হলো। এর একটিতে ছিলো পানি, দ্বিতীয়টিতে দুধ, তৃতীয়টিতে শরাব। তিনি দুধের পেয়ালা হাতে উঠিয়ে নিলেন। জিবরীল (আ) মোবারকবাদ জানালেন। বললেন, আপনি প্রকৃতির পথ অবলম্বন করলেন।

এরপর একটি সিঁড়ি তাঁর সামনে পেশ করা হলো। জিবরীল (আ) তাঁকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আকাশের দিকে চলে গেলেন। আরবী ভাষায়

সিঁড়িকে মে'রাজ বলা হয় এবং সামঞ্জস্যের কারণে এ পূর্ণ ঘটনা মে'রাজ নামে খ্যাত হয়েছে।

প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা বন্ধ পেলেন। দ্বাররক্ষী ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কে আসছেন ? জিবরীল তাঁর নিজের নাম বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথে কে আছেন ? উত্তরে জিবরীল (আ) বললেন, মুহাম্মাদ (স)। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? বললেন, হ্যাঁ ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা দরজা খুলে দিলেন। এখানে হৃদয় নিংড়ানো সংবর্ধনা জানানো হলো। এখানে অবস্থানরত ফেরেশতাকুল ও মহামানবদের রূহের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এখানে এঁদের মধ্যে খুবই শানদার উজ্জল ব্যক্তিত্বের একজন মহামানব ছিলেন। মানবীয় গঠনের পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন তিনি। চেহারা, অবয়ব-গঠন কোনো দিকে কোনো ত্রুটি ছিলো না। জিবরীল (আ) বললেন, ইনি হলেন আদম (আ), আপনার সর্বপ্রথম পূর্বসুরী। এই মহামানবের আশেপাশে আরো অনেক লোক ছিলেন। তিনি ডান দিকে তাকালে খুশি হতেন, আর বাঁদিকে তাকালে কেঁদে ফেলতেন। জিজ্ঞেস করলেন, এর রহস্য কি ? উত্তরে বলা হলো, এরা আদম সন্তান। আদম (আ) তাঁর নেক সন্তানদেরকে দেখে খুশী হতেন। আর বদ সন্তানদেরকে দেখলে কেঁদে ফেলতেন।

তারপর তাঁকে বিস্তারিত দেখার সুযোগ দেয়া হলো। এক জায়গায় তিনি দেখলেন কিছু লোক ফসল কাটছে। আর যত কাটে ততই তা বেড়ে চলে। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, এঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতেন।

তারপর দেখলেন, পাথর দিয়ে কিছু লোকের মাথা চূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন কারা এরা ? বলা হলো যাদের অলসতা তাদেরকে নামায পড়ার জন্য উঠতে দিতো না। আরো কিছু লোক দেখলেন, যাদের পোশাকের সামনের ও পেছনের দিকে তালি লাগানো ছিলো। তারা পশুর মতো ঘাস খাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, এরা মালের যাকাত-খয়রাত কিছুই দিতো না।

তারপর একটি লোককে দেখলেন, কাঠের বোঝা একত্র করে মাথায় উঠাবার চেষ্টা করছে। মাথায় উঠাতে না পারলে তা নামিয়ে আবারো কিছু কাঠ এর সাথে বাড়িয়ে নেয়। জিজ্ঞেস করলেন, এ মূর্খরা কারা ? উত্তরে বলা হলো, এরা ওই ব্যক্তি যাদের আমানত ও দায়িত্বের এত বোঝা ছিলো

যে, তা পালন করতে পারতো না, কিন্তু এরপরও তারা এসব না কমিয়ে বেশী দায়িত্বভার তাদের উপর উঠিয়ে নিতো।

তারপর দেখলেন, কিছু লোকের ঠোঁট ও জিহবা কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কারা এরা ? বলা হলো, এরা দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তা (ওয়ায়েয)। মুখে যখন যা আসতো তাই বলতো ও ফিতনা সৃষ্টি করতো।

আর এক জায়গায় দেখলেন, একটি পাথর ফেটে ওখান দিয়ে একটি মোটা তাজা গরু বের হয়ে আসলো। এ গরুটি পুনরায় ওই ফাটল দিয়ে ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু যেতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? বলা হলো, এটা হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দায়িত্বহীনভাবে কথাবার্তা বলে ঝগড়া ফাসাদ লাগিয়ে দিতো। তারপর লজ্জিত হয়ে তা শুধরাতে চাইতো, কিন্তু পারতো না।

অন্য এক জায়গায় কিছু লোক নিজেদের দেহের গোশত কেটে কেটে খাচ্ছিলো। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, এরা অন্যদেরকে গালিগালাজ করতো।

তাদেরই কাছে কিছু লোক ছিলো, যাদের নখ ছিলো তামার এবং তা দিয়ে তারা মুখ ও বুক খামচাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, এরা হলো সেইসব লোক যারা মানুষের অনুপস্থিতে তাদের নামে কুৎসা রটাতো ও মান ইয্যতের উপর হামলা করতো।

আরো কিছু লোক দেখলেন, যাদের ঠোঁট দেখতে উটের মতো। এরা আগুন খাচ্ছিলো। বললেন, এরা কারা ? বলা হলো, এরা ইয়াতীমের মাল আত্মসাত করতো।

এরপর দেখলেন, এমন কিছু লোক যাদের পেট খুব বড় যা সাপে ভর্তি ছিল। যাতায়াতকারীরা এদেরকে পদদলিত করে যেতো। কিন্তু তারা নিজেদের জায়গা হতে নড়তে পারতো না। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, এরা সুদখোর।

এরপর আরো কিছু লোক দৃষ্টিগোচর হলো। এদের একপাশে পবিত্র ও চর্বিযুক্ত গোশত রাখা ছিল আর অন্যদিকে রাখা ছিল বাসিপঁচা খাবার যা থেকে দুর্গন্ধ আসছিলো। সেই ভাল গোশত রেখে দিয়ে তারা বাসি পঁচা গোশত খাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, এরা সেই নারী পুরুষ যারা হালাল স্বামী ও হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হারামভাবে নিজেদের চাহিদা মিটাতো।

তারপর দেখলেন, কিছু নারী নিজেদের সিনার উপর করে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? বলা হলো, সেসব নারী যারা তাদের স্বামীদের ঘাড়ে এমন বাচ্চা চাপিয়েছে যা তাদের ঔরষজাত নয়।

এসব দৃশ্য দেখার এক পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর এমন এক ফেরেশতার সাথে দেখা হলো, যিনি খুব রুক্ষভাবে মিলিত হলেন। জিবরীলকে (আ) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত হলো তাঁরা সকলে হাসিখুশী ও আলোয় ঝলমল চেহারায় সাক্ষাত করলেন। এ ফেরেশতার এত রুক্ষ মেজাজের কারণ কি ? জিবরীল (আ) বলেন, এর হাসির কোনো কারণ নেই। সেতো জাহান্নামের দারোগা। একথা শুনে তিনি জাহান্নাম দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। একথা শুনে তিনি হঠাৎ করে সামনের পর্দা উঠিয়ে ধরলেন। আর অমনি জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থাসহ চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

এ স্তর পার হয়ে তিনি দ্বিতীয় আসমানে পৌছলেন। এখানকার মহান ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন তরুণ সকলের চেয়ে ঝকঝকে ছিলেন। পরিচয়ের পর জানা গেলো এঁরা হলেন হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম।

তৃতীয় আসমানে তাঁকে এমন এক মহান ব্যক্তির সাথে পরিচয় করানো হলো যাঁর রূপসৌন্দর্য সাধারণ মানুষের তুলনায় তেমন, যেমন তারকার তুলনায় পূর্ণিমা রাতের চাঁদ। ইনিই ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম।

চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আ), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। সপ্তম আকাশে পৌছে একটি আজিমুশশান মহল (বায়তুল মামূর) দেখলেন। এখানে অসংখ্য ফেরেশতা আসছিল যাচ্ছিল। এখানে তাঁর সাথে এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত হলো যাঁর সাথে তার সাদৃশ্য ছিলো। পরিচয়ে জানতে পারলেন, ইনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।

এরপর আরো উপরে আরোহণ করতে শুরু করলেন। উঠতে উঠতে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পৌছে গেলেন। এ সিদরাতুল মুনতাহা আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের উপস্থিতির দরবার ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে সীমারেখা হিসেবে গণ্য। নীচ দিয়ে অতিক্রমকারীরা এখানে এসে থেমে যায়, আর উপর থেকে আহকাম ও কানুন সরাসরি এখানে আসে। এ জায়গার

কাছাকাছি তাঁকে জান্নাত দেখানো হলো। তিনি দেখলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সালেহ বান্দাদের জন্য সেইসব কিছু তৈরী করে রেখেছেন যা না কোনো চোখ দেখেছে আর না কোনো কান শুনেছে। আর না কেউ এর ধারণা পর্যন্ত করতে পারে।

'সিদরাতুল মুনতাহা' এসে জিবরীল (আ) থেমে গেলেন। আর রাসূল (স) সামনে অগ্রসর হলেন। একটি উঁচু প্রশস্ত ছাদে পৌঁছলেন। 'বারে গাহে ইলাহী' (আল্লাহর দরবার) সামনে ছিলো। সেখানে তিনি পরস্পর কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যেসব কথা এরশাদ হলো, তার দু' একটি নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হলো।

(২) সূরা আল বাকারার শেষ দুই আয়াত শিক্ষা দেয়া হলো।

(৩) শিরক ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ মাফ করার সম্ভাবনা প্রকাশ করা হলো।

(৪) এরশাদ হলো, যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তার জন্য একটি নেক লেখা হয়। আর যখন সে তার বাস্তব আমল করে, তখন দশটি নেক লেখা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে তার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হয় না। আর যখন সে তা বাস্তবে করে তখন তার জন্য একটি মাত্র পাপ লেখা হয়।

আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে নীচে নেমে এলে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি কার্যবিবরণী শুনে বললেন, বনী ইসরাঈলের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমার মনে হয়, আপনার উম্মতগণ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। ফিরে যান, সালাত আরো কমিয়ে দেবার দরখাস্ত পেশ করুন। তিনি ফিরে গেলেন। আল্লাহ জাল্লাশানুহু দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন। ফিরে আসলে হযরত মূসা (আ) আবারও ওই কথা বললেন। তাঁর কথায় তিনি বারবার উপরে যেতে থাকলেন। প্রত্যেক বার দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিতে লাগলেন। সর্বশেষ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হবার হুকুম হলো। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান।

সফর থেকে ফিরে আসার পথে সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে তিনি বায়তুল মাকদিস এলেন। এখানেও আবার সকল নবী-রাসূলগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এখানেও সকলের সালাত পড়ালেন। সম্ভবত এটা ফজরের সালাত ছিলো। তারপর বুরাকে আরোহণ করে মক্কা শরীফে ফিরে এলেন।

ভোরে সকলের আগে তিনি তার চাচাতো বোন উম্মে হানীকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনালেন। তারপর বের হয়ে যেতে চাইলে উম্মে হানী (রা) তাঁর চাদর টেনে ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে একথা মানুষকে শুনাবেন না। আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য তারা একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে যাবে। কিন্তু রাসূল (স) একথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন যে, আমি অবশ্যই তা বর্ণনা করবো। কাবার হারাম শরীফে পৌছলে আবু জাহেল সামনে পড়লো। সে বললো, কী খুব তাজা খবর ? উত্তরে রাসূলে করীম (স) বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলো, কি খবর ? বললেন, আমি আজ রাতে বায়তুল মাকদিস গিয়েছিলাম। আবু জাহেল বললো, বায়তুল মাকদিস ? রাতে রাতে ফিরে এসেছ ? আর সকালে এখানে উপস্থিত ? মহানবী (স) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আবু জাহেল বললো, লোকজন জড়ো করাবো ? সকলের সামনে একথা বলবে ? রাসূল (স) এরশাদ করলেন, নিশ্চয়। এবার আবু জাহেল চিৎকার দিয়ে দিয়ে সকলকে জড়ো করে ফেললো এবং বললো, এসো এখন বলো। সকলের সামনে তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। লোকজন ঠাট্টা করতে শুরু করলো, দুই মাসের সফর এক রাতে ? অসম্ভব, হতেই পারে না। প্রথমত সন্দেহ ছিলো, এখন বিশ্বাস হলো যে, তুমি বড্ড পাগল হয়ে গিয়েছো।

এমুখ ওমুখ হতে হতে মুহূর্তের মধ্যে গোটা মক্কায় এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। কতক মুসলমান এ খবর অবাস্তব ভেবে ইসলাম ত্যাগ করলো। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন রাসূলের ডান হাত। তারা তাঁর কাছে দৌড়িয়ে গেলো। তাদের আশা ছিলো, আবু বকরও এ খবর বিশ্বাস করবেন না। তিনি ইসলাম থেকে ফিরে গেলে এ আন্দোলন নির্জীব হয়ে পড়বে। তাদের মুখে ঘটনা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, যদি এ ঘটনা সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ (স) বলে থাকেন, তাহলে তা নিশ্চয় সত্য। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমিতো রোজই শুনি, তাঁর নিকট আসমান থেকে পয়গাম আসে এবং তা বিশ্বাসও করি।

এরপর হযরত আবু বকর (রা) হেরেমে কা'বায় এলেন। রাসূল (স) সেখানে ছিলেন। হাসি ঠাট্টার সভাও চলছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কী আপনি একথা বলেছেন ? জবাবে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, বায়তুল মাকদিস আমার দেখা আছে। আপনি ওখানকার নকশা বর্ণনা করুন। সাথে সাথেই তিনি নকশা বলা শুরু করলেন। প্রতিটি জিনিস এমনভাবে বলতে লাগলেন যেন বায়তুল মাকদিস তাঁর চোখের সামনে বিদ্যমান, আর দেখে দেখে তিনি এর বর্ণনা দিচ্ছেন। আবু

বকর (রা)-এর এ কৌশল অবলম্বন মিথ্যাবাদীদের চোখেমুখে চুন পড়লো। ব্যবসায়ের জন্য বায়তুল মাকদিস যেতো এমন অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলো। বর্ণিত নকশা পুরাপুরি সত্য। তারা মনে মনে বলতে লাগলো। এখন লোকেরা সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য আরো প্রমাণ চাইতে লাগলো। তিনি বললেন, যাবার সময় আমি অমুক জায়গায় অমুক কাফেলা অতিক্রম করেছি। তাদের সাথে এই মালপত্র ছিলো। কাফেলার উট বুরাক দেখে চমকে উঠেছিলো। একটি উট অমুক মাঠের দিকে দৌড়ে পালিয়েছে। আমি কাফেলাকে এর ঠিকানা দিয়েছি। আসার পথে অমুক মাঠে অমুক কাফেলার সাথে আমার দেখা হয়। সব লোক ঘুমিয়েছিলো। আমি তাদের পাত্র থেকে পানি পান করেছি। পানি যে পান করা হয়েছে, এমন আলামতও রেখে এসেছি। এভাবে আরো কিছু ঘটনা তিনি বললেন। পরে সেই সব কাফেলা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। এভাবে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের মন চিন্তা করতে থাকে এটা কী করে সম্ভব? আজও কিছু কিছু লোক ভাবছে এ ঘটনা কি করে সম্ভব ?

শবে বরাত

সাধারণত শবে বরাতকে মুসলমানদের একটি পর্ব বা খুশির দিন বলে মনে করা হয়। এর জন্য কিছু রসম রেওয়াজও গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলো বেশ কড়াকড়ির সাথে পালন করা হয়। ধুমধাম ও জাকজমকের বিচারেতো যেন মোহররমের পরপরই এর স্থান। কিন্তু সত্য কথা হলো, এটা অযথা একটি মনগড়া পর্ব। না কুরআন মজীদে এর কোনো ভিত্তি আছে না হাদীস শরীফে। না সাহাবায়ে কেরামের যুগের ইতিহাসে এর কোনো নাম নিশানা পাওয়া যায়। আর না প্রাথমিক কালের বুযর্গানে দ্বীনের কেউ এটাকে ইসলামের পর্ব বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম রসম রেওয়াজ ও পালা পার্বণের দীন নয়। ইসলামতো একটি সাদাসিদা ও যুক্তিসঙ্গত দীন। এ দীন মানুষকে রসম রেওয়াজের বেড়াজাল থেকে, খেল তামাশার অর্থহীন কাজকর্মে মশগুল হওয়া থেকে বাজে কাজে সময়, শ্রম ও সম্পদ অপচয় থেকে রক্ষা করে জীবনকে বাস্তব সত্যের দিকে আকৃষ্ট করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও কল্যাণের কাজে মানুষকে ব্যস্ত রাখে। এমন একটা দীনে প্রকৃতির সাথে এরূপ কাজের কোনো সামঞ্জস্য নেই যে, সে বছরে একদিন হালুয়া রুটি পাকানো ও আঁতশবাজী করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেবে আর মানুষকে বলবে যে, তুমি বিশেষভাবে প্রতি বছর নিজের জীবনের কিছু মূল্যবান সময় ও নিজের কষ্টার্জিত ধনের বেশকিছু অংশ বরবাদ করতে থাকো। এর চেয়েও দূরতম কথা হলো এই যে, ইসলাম এমন কোনো রসম রেওয়াজ পালন করতে অভ্যস্ত করবে, যা শুধু সময় ও টাকা পয়সাই বরবাদ করে না, বরং কোনো কোনো সময় জীবননাশের ঘটনাও ঘটে এবং ঘরবাড়ী পর্যন্ত এই শিখা গিয়ে পৌঁছে। এ ধরনের বাজে কাজের নির্দেশ দেয়াতো দূরের কথা, যদি এমন ধরনের কোনো রেওয়াজ নবী করীম (স)-এর যামানায় বিদ্যমান থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই আইন প্রয়োগ করে তা বন্ধ করে দেয়া হতো। আর এ ধরনের যেসব রেওয়াজ সে সময় প্রচলিত ছিলো তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হালুয়া ও আঁতশবাজীর ব্যাপারটাতো এত পরিষ্কার যে, যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছুও জানে সেও প্রথম দৃষ্টিতেই বলে দেবে যে, এসব কাজ করা এ দীনের স্পিরিটের খেলাপ। কিন্তু আমরা যখন তালাশ করি যে, শাবান মাসের এ বিশেষ দিনের সাথে কোনো নির্ভরযোগ্য ধর্মীয়

আকীদা সংশ্লিষ্ট আছে কিনা অথবা কোনো আবশ্যকীয় ইবাদাত নির্ধারিত আছে কিনা, তখন এর কোনো নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। ইসলামী সাহিত্যে যদি বেশী কিছু পাওয়া যায় তবে তা শুধু এই যে, একবার শাবান মাসের ১৫ তারিখ রাতে হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিছানায় না পেয়ে তালাশ করতে বেরিয়ে পড়লেন। তালাশ করতে করতে তিনি 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে গিয়ে তাঁকে পেলেন। এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানের দিকে দৃষ্টি দান করেন এবং কালব গোত্রের ভেড়াগুলোর দেহে যে পরিমাণ লোম আছে তত সংখ্যক মানুষের গুনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু হাদীসের বিখ্যাত ইমাম তিরমিযী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি এ বর্ণনাটিকে 'যয়ীফ' বলেছেন এবং নিজের অনুসন্ধান সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীসের সনদ সঠিকভাবে হযরত আয়েশা (রা) পর্যন্ত পৌছে না। অন্য কতিপয় হাদীসে যা কিছু কম মর্যাদাসম্পন্ন হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাতে এ রাতের ফযিলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে ভাগ্যের ফয়সালা করা হয়, জন্ম ও মৃত্যুর বিষয় চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু এ হাদীসই দুর্বল। প্রতিটি হাদীসের সনদেই কোনো কোনো দুর্বলতা বিদ্যমান। এজন্য হাদীসের প্রাচীনতর ও অধিক নির্ভরযোগ্য কিতাবের কোথাও এ হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তারপরও যদি এর কোনো ভিত্তি স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে শুধু এতটুকই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে, এ রাতে ইবাদাত করা ও আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা একটি উত্তম কাজ যা ব্যক্তিগতভাবে করলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। এসবই রিওয়ায়াত হতে এর বেশী কিছু প্রমাণিত হয় না, যার ভিত্তিতে মনে করা যেতে পারে যে, ১৪ তারিখে বা ১৫ তারিখের রাতকে ইসলামে ঈদ সাব্যস্ত করা হয়েছে অথবা কোনো সামাজিক ইবাদাত হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

হাদীসের অধিক নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ হতে যে কথা প্রমাণিত তা এই যে, রমযান মাস আসার আগেই শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এক বিশেষ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতো। রমযান হলো সেই মাস, যে মাসে আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)-কে নবুওয়াতের মতো মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং কুরআনের মতো চিরস্থায়ী কিতাব নাযিল শুরু হয়েছে। এ কারণে শুধু রমযান মাসেই তিনি অসাধারণ ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল হতেন না বরং এর আগে থেকেই তাঁর ধ্যান আল্লাহর সাথে লেগে যেতো। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন, রমযান ছাড়া বছরের বাকী এগার মাসের মধ্যে শুধু

শাবান মাসই এমন, যে মাসে তিনি সবচেয়ে বেশী রোযা রাখতেন। প্রায় গোটা মাসই তিনি রোযা অবস্থায় কাটাতেন। কিন্তু এ আমল শুধু তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। আল্লাহর সাথে তাঁর গভীর রূহানী সম্পর্কের কারণেই তা সম্ভব ছিলো। কুরআন নাযিল হওয়ার মাস থেকেই তাঁর এ বৈশিষ্ট্য ছিলো। সাধারণ মুসলমানদের জন্য শাবান মাসের শেষ পনর দিন রোযা না রাখার জন্য তিনি হেদায়াত দিয়েছেন। কেননা এ মাসের শেষের পনরদিন মানুষ রোযা রাখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, ধীরে ধীরে তা একটা অপরিহার্য প্রথায় পরিণত হয়ে যাবার আশংকা ছিল। আর রমযান মাসের ফরয রোযার উপর অযথা আরো দশ পনরটি রোযা যুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে মানুষের উপর এমন একটা বোঝা চাপবে, যা আল্লাহ তাদের উপর চাপাননি।

ইসলামে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, আল্লাহপাক বান্দাদের উপর যে কাজ অপরিহার্য করেছেন, এছাড়া আর কোনো কাজ যেন বান্দাহ তার নিজের উপর অপরিহার্য করে না নেয়। কোনো স্বরচিত রসম রেওয়াজ, কোনো কৃত্রিম নিয়ম-কানুন, কোনো সামষ্টিক তৎপরতা এমন হতে পারবে না যার অনুসরণ লোকদের জন্য ফরযের মতো হয়ে যাবে। আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ কোন্ কাজের অনুসরণে রয়েছে এবং কোন্ কাজের কতটুকু অনুসরণে রয়েছে, তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাঁর কায়েম করা সীমা অতিক্রম করে বান্দাদের নিজ থেকে যদি কোনো রসম রেওয়াজ নির্দিষ্ট করে নেয় এবং ফরযের মতো গুরুত্ব দিয়ে তা পালন করে তাহলে তারা নিজেরা নিজেদের জীবনকে সংকটে ফেলবে। অতীতের জাতিগুলো এ ভুলই করেছিলো। তারা নতুন নতুন রেওয়াজ রীতি আবিষ্কার করে নিজেদের উপর ফরয ওয়াজিবের বোঝা চাপাতে থাকে এবং ধীরে ধীরে রেওয়াজ রসমের এমন এক জাল নিজেদের চারদিকে বিস্তার করে ফেললো যে, তা অবশেষে তাদের হাত পা বেঁধে ফেললো। রেওয়াজ রসমকে কুরআন জিঞ্জিরের সাথে তুলনা করে বলে দিয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর মিশনের একটা বড় কাজ হলো—এসব জিঞ্জির টুকরা টুকরা করে দূরে নিক্ষেপ করা, যার মধ্যে তারা নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছে। এ কারণেই শরীআতে মুহাম্মাদীতে ফারায়েযের একটা খুবই হালকা ও সহজ নিয়ম ঘোষণা করে বাকী সব রেওয়াজ রসমের অবসান ঘটানো হয়েছে। রমযানের ঈদ ও কুরবানীর ঈদ ছাড়া আর কোনো পর্ব রাখা হয়নি। হজ্জ ছাড়া আর কোনো বাধ্যতামূলক সফর রাখা হয়নি। যাকাত ছাড়া কোনো নযর-নিয়ায বা দান-খয়রাত ফরয করা হয়নি। একটা চিরন্তন নীতিমালা

ঠিক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ফরয কাজে যেভাবে কিছু জিনিস হ্রাস করার অধিকার কারো নেই এভাবে বাড়াবাড়িরও নেই কোনো অধিকার।

প্রাথমিক কালে যেসব লোক শরীআতে মুহাম্মাদীর প্রাণসত্তাকে বুঝতো তারা কঠোরভাবে এ নীতিমালা অনুসরণ করে চলতো। তারা কোনো নতুন রেওয়াজ প্রচলিত করা হতে বিশেষভাবে বিরত থেকেছেন এবং যে জিনিস বাধ্যতামূলক রসমে পরিণত হতে যাচ্ছে বুঝতে পারতেন, সাথে সাথে তার মূল কেটে ফেলতেন। তাদের জানা ছিলো, কোনো কাজকে নেকী ও সওয়াবের কাজ মনে করে প্রথম প্রথম খুব ভালো নিয়তেই শুরু করার পর ধীরে ধীরে তা কিভাবে প্রথম সুন্নাত তারপর ওয়াজিব তারপর ফরয এবং সবশেষে ফরযের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম জিনিসে পরিণত হয় এবং অজ্ঞতার কারণে লোকেরা এই সাথে কিভাবে অসংখ্য খারাপ কাজকে মিশ্রিত করে একটি নিকৃষ্ট রসম বানিয়ে নেয় এবং এই প্রকারের রসম জমা হয়ে কিভাবে মানব জীবনে একটি আপদ এবং মানব জীবনের উন্নতির পথে একটি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য প্রাথমিক কালের আলেম ও ইমামগণ শরীআতে কোনো বাড়তি কাজের প্রচলন যেন গড়ে উঠতে না পারে, এদিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যা শরীআতে নেই তাকে শর'ঈ মর্যাদা দেয়া, অথবা যে কাজের শরীয়তে যে মর্যাদা আছে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়াই হলো 'বিদআত' এবং প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ! পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এদিকে চরম অমনোযোগ ও অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং মুসলমানরাও ধীরে ধীরে নিজেদের মনগড়া রেওয়াজ রসমের জালে এমনভাবে আটকে যেতে লাগলো, যেভাবে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিও ফেঁসে গিয়েছিলো। এ ক্ষতির একটি বড় কারণ হলো—পরবর্তীকালে যেসব জাতি ইসলাম গ্রহণ করে তারা ইসলামের সঠিক তালীম তরবিয়াত পাননি। তারা নিজেদের সাথে তাদের পুরানো জাহিলিয়াতের অনেক ধ্যান ধারণা, অনেক নিয়ম পদ্ধতি নিয়ে ইসলামের সীমায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে শত শত বছরের রসম রেওয়াজ, পূজা-পার্বণ, মেলা, যাত্রা ইত্যাদি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। এগুলো ছাড়া তাদের ধর্মীয় জীবনে কোনো মজাই ছিলো না। ইসলামের সহজ সরল শরীআতের সীমার মধ্যে এসে ঐসব পুরনো রসম রেওয়াজের বোঝা নামিয়ে ফেলা ও পুরনো জিঞ্জিরের বন্ধন কেটে প্রশান্তি লাভ করার পরিবর্তে এখানে এসে তারা ঐসব বোঝা কিভাবে আবার মাথায় উঠিয়ে নেবে যা ইসলাম নামিয়ে দিয়েছিলো, ওই সব জিঞ্জির আবার পরে নেবে যা ইসলাম কেটে দিয়েছিলো, সেই চিন্তা

করতে লাগলো। সুতরাং তারা কিছু প্রাচীন জাহেলিয়াতের রসম রেওয়াজের প্রকাশ্য রূপ পরিবর্তন করে রেখে দেয়, কিছু নতুন রেওয়াজ আবিষ্কার করে, এমনকি তাদের পুরনো ধর্মের মতো ইসলামকেও রসম রেওয়াজ ও পালা পার্বণের ধর্ম বানিয়ে ছাড়লো। এ নতুন রেওয়াজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাশায়াল্লাহ বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যবহার করা হলো। ইসলাম মানুষের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা ঠিক করেছে তার নীতিমালা জানার জন্য কুরআন হাদীস খুঁজে দেখা হয়নি, বরং নতুন নতুন রসম চালু করার জন্য বা প্রাচীন জাহেলী রসম চালু রাখার জন্য কোনো বাহানা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর যদি কোথাও সামান্যতম ইংগিতও মিলে যেতো তাহলে তার উপরই একটি পাহাড়সম ইমারত নির্মাণ করে ফেলা হয়েছে। ইসলামে পালা পার্বণের যে অভাব ছিলো তা পূরণ করতে পেরেছে এই ভেবে লোকেরা আত্মতৃপ্তি বোধ করত। অথচ তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে সেইসব বেড়ী পরে নিলো যা আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং তারা তাদের নিজেদের সেই জালে ফাঁসিয়ে দিলো, যাতে আটকে পড়ে দুনিয়ার কোনো জাতি কখনো আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

রোযা এবং আত্মসংযম

রোযার অসংখ্য নৈতিক ও আত্মিক সুফলের মধ্যে একটি হলো রোযা। মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি সৃষ্টি করে। একথা পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ংগম করার জন্য আমাদেরকে আগে আত্মসংযমের অর্থ বুঝতে হবে। তারপর আমরা জানবো ইসলাম কোন্ ধরনের আত্মসংযম দাবী করে এবং তারপর আমরা দেখবো রোযা কিভাবে এ শক্তি সৃষ্টি করে।

আত্মসংযম অর্থ মানুষের 'খুদী' (ব্যক্তিত্ব) তার দেহ ও শক্তিকে উত্তমরূপে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না ও আবেগের উপর তার নিয়ন্ত্রণ এতটা মজবুত হবে যে, সেগুলো তার ফয়সালার অধীন হয়ে থাকবে। মানুষের সত্তার খুদীর মর্যাদা তাই যা একটি দেশে তার শাসকের হয়ে থাকে। দেহ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অহমের হাতিয়ার। সমস্ত দেহের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি অহম এর সেবায় নিয়োজিত। নফস বা প্রবৃত্তির ভূমিকা শুধু এটুক যে, সে খুদীর নিকট নিজের দাবী দরখাস্ত আকারে পেশ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার খুদীর। সে এসব হাতিয়ার ও শক্তি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে এবং প্রবৃত্তির আবেদনসমূহের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করবে এবং কোন্‌টি প্রত্যাখ্যান করবে, এ সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। যদি কোনো 'খুদী' এতটা দুর্বল হয় যে, সে দেহের রাজ্যে নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার আদেশ কার্যকর করতে পারে না এবং সে যদি নফসের চাহিদা, দাবী ও আদেশের মর্যাদা রাখে তাহলে সে হবে একটা পরাজিত ও অসহায় খুদী। তার উদাহরণ সেই আরোহীর সাথে হতে পারে, যে নিজেই তার ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। এরূপ দুর্বল মানুষ বিশ্বে কোনো ধরনের সফল জীবনযাপন করতে পারে না। মানব ইতিহাসে যেসব লোক নিজেদের কোনো পদচিহ্ন রেখে গেছেন, তাঁরা নিজেদের সত্তায় নিহিত শক্তিকে জোরপূর্বক নিজেদের হুকুমের অধীন করে রেখেছেন। তাঁরা নিজের নফসের খাহেশের বান্দা এবং আবেগের গোলাম হয়ে নয়, বরং তার মনিব হয়ে থেকেছেন। তাদের ইচ্ছাশক্তি ছিলো মযবুত ও সংকল্প ছিলো দৃঢ়।

কিন্তু বিস্তর পার্থক্য সেই খুদীর মধ্যে যা নিজেই খোদা বনে যায় এবং সেই খুদীর মধ্যে যা খোদার অনুগত হয়ে কাজ করে। খুদীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম জীবন সাফল্য মণ্ডিত। কিন্তু যে খুদী নিজের স্রষ্টা থেকে মুক্ত স্বাধীন এবং দুনিয়ার মালিকের অমুখাপেক্ষী, যে কোনো উন্নত নৈতিক

বিধানের অনুগত নয়, যে কারো কাছে জবাবদিহির আশংকামুক্ত, সে যদি নিজের দেহ ও নফসের শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে একটি প্রবল খুদী বনে যায় তাহলে এ খুদী দুনিয়াতে ফেরাউন, নমরূদ, হিটলার, মুসেলিনী ও স্টালিনের মতো বড় বড় ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারীই জন্ম দিতে পারে। এ ধরনের প্রবৃত্তি বা নফস নিয়ন্ত্রণকারীও প্রশংসার যোগ্য নয় এবং ইসলামেরও কাম্য নয়। ইসলাম যে নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি তাহলো প্রথমে মানুষের খুদী আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির অবনত করবে, তাঁর সন্তুষ্টির অনুসন্ধানী ও তাঁর আইনের অনুগত হওয়াকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেবে, তাঁর সামনে নিজেকে জবাবদিহির জন্য দায়ী মনে করবে। তাহলে এ মুসলিম ও মুমিন খুদীর নিজের দেহ ও তার শক্তির উপর হাকিমের মতো ক্ষমতা এবং নিজের নফস ও এর চাহিদার উপর জবরদস্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ হাসিল হবে। যাতে সে দুনিয়াতে একটি সংশোধনকারী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই হলো আত্মসংযমের প্রকৃত তাৎপর্য। এখন আসুন, আমরা দেখি রোযা কিভাবে মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি সৃষ্টি করে।

দেহ ও নফসের দাবীর মূল্যায়ন করলে আমরা জানতে পারি, এর মধ্যে তিনটি দাবীই মৌলিক ও বুনিয়াদী এবং এগুলোই হলো সর্বোচ্চ শক্তিশালী দাবী। একটি হলো খাদ্যের দাবী। এর উপরই দৈহিক জীবনের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। দ্বিতীয় হলো যৌন ক্ষুধার দাবী। এ দাবী মানব বংশের ধারা অব্যাহত থাকার উপায়। আর তৃতীয় হলো, আরাম আয়েশের দাবী, যা কার্যক্ষমতা বজায় থাকার জন্য প্রয়োজন। এ তিনটি দাবীই যদি এর সীমার ভিতরে থাকে তাহলে এটাই হবে প্রকৃতির আসল উদ্দেশ্যের অনুরূপ। কিন্তু নফস ও দেহের নিকট এ তিনটি জিনিসই এমন যে, সামান্য শিথিলতা পেলেই সে এদের জালে ফেঁসে গিয়ে মানুষের খুদীকে উল্টো নিজের গোলামে পরিণত করে। এগুলোর প্রতিটির বর্ধিত দাবী বর্ধিত হতে হতে দাবীনামার একটি তালিকা হয়ে যায় এবং প্রতিটি জোর দেয় যে, মানুষ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য, নিজের নীতিমালা, নিজের বিবেকের সিদ্ধান্ত ভুলে গিয়ে শুধু তার দাবী পূরণ করতে লেগে থাকুক। একটি দুর্বল খুদী যখন এসব দাবীর কাছে পরাজিত হয়ে যায়, তখন খাদ্যের দাবী তাকে পেটের দাস বনিয়ে দেয়। যৌন ক্ষুধা তাকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। আর দেহের ভোগ-বিলাস তার মধ্যে কোনো জীবনীশক্তি অবশিষ্ট থাকতে দেয় না। তাই সে খুদী তার নফস ও দেহের

শাসক না হয়ে শাসনাধীন হয়ে থাকে। তখন তার হুকুমকে ভাল ও মন্দ জায়েয ও নাজায়েয, হালাল ও হারামসহ সকল পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ থাকে না।

রোযা নফসের এ তিনটি চাহিদাকেই তার নিয়মের অধীনে গেঁথে ফেলে এবং খুদীকে এদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের অনুশীলন করায়। যে খুদী আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে তাকে সে এই খবর দেয় যে, তোমার আল্লাহ আজ সারাদিনের জন্য দানাপানি তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে তোমার মালিক আজ তোমার যৌন সম্ভোগও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হালাল পদ্ধতিতেও এসব পূরণ করা হারাম। রোযা তোমাকে একথা বলে দিচ্ছে যে, গোটা দিন ভুখাপিয়াস থেকে যখন তুমি ইফতার করবে, যেন অবচেতন হয়ে শুয়ে না থেকে অন্যান্য দিনের চেয়েও আরো বেশী ইবাদাতে লেগে যাওয়াতে তোমার আল্লাহ তাআলার সন্তোষ নিহিত। সে তাকে এ হুকুমও দেয় যে, নামাযের লম্বা লম্বা রাকআত থেকে অবসর হওয়ার পর তুমি আরামের বিছানায় শুয়ে পড়ে ভোর পর্যন্ত গভীর ঘুমে বেহুঁশ পড়ে থেকো না ; বরং দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচীর বিপরীতে সাহরী খাবার জন্য ভোর হবার আগে উঠে পড়ো এবং খাদ্য গ্রহণ করো। এসব নির্দেশ পৌছে দেবার পর সে এর উপর আমল করার ব্যাপারটা স্বয়ং তার উপর ছেড়ে দেয়। তার পেছনে কোনো পুলিশ কোনো সি. আই. ডি বা বাইরে থেকেও কোনো পাহারা লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়নি। সে যদি চুপ করে কিছু খেয়ে নেয় অথবা যৌন সম্ভোগ করে, তাহলে আল্লাহ ছাড়া এ কাজ আর কেউ দেখার নেই। সে যদি তারাবীহর নামায এড়ানোর জন্য কোনো শরঈ বাহানা যোগাড় করে নেয়, তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে এজন্য গ্রেফতার করতে পারে না। সব কিছুই তার নিজের উপর নির্ভর করে। মু'মিনের 'খুদী' সত্যিকার খোদারই অনুগত হয়ে থাকে আর তার ইচ্ছাশক্তিতে যদি নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে সে নিজেই খাবার প্রয়োজন, যৌন ক্ষুধা এবং আরামপ্রিয়তাকে সেই নিয়মের সাথে জুড়ে দেবে, যা আজ স্বাভাবিক কাজের খেলাফ হিসেবে তার জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

এটা শুধু একদিনের অনুশীলন নয়। এ ধরনের অনুশীলনের জন্য একদিন যথেষ্টও হতে পারে না। তিরিশ দিন ধারাবাহিকভাবে খুদীকে দিয়ে এ অনুশীলন করানো হয়। বছরের মধ্যে পূর্ণ ৭২০ ঘন্টার জন্য এ

কর্মসূচী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে উঠে সাহরী খাও। ভোরের আভা উদ্ভাসিত হতেই পানাহার বন্ধ করে দাও। সারাদিন কোনো খাদ্যখাদক গ্রহণ করতে পারবে না। সূর্য ডুবে যাবার পর সঠিক সময়ে ইফতার করে এরপর রাতের একটি অংশে অন্য মাসের ব্যতিক্রমে তারাবীর নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। কয়েক ঘন্টা শুয়ে আরাম করার পর দ্বিতীয় দিনের জন্য আবার এ কর্মসূচীই গ্রহণ করো। এভাবে গোটা মাস একাধারে নফসের এ তিনটি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী দাবীগুলোকে নিয়মের মধ্যে ফেলে দিলে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আত্মা ও দেহের উপর হুকুম চালাবার ক্ষমতা খুদীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এটাও জীবনে শুধু একবারের প্রেগ্রাম নয়, বরং বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি বছর একটি মাস এর জন্য ওয়াক্ফ করে দেয়া হয়েছে। তাহলেই প্রবৃত্তির উপর খুদীর নিয়ন্ত্রণ বারবার তাজা ও কঠোর হতে থাকে।

এসব অনুশীলন শুধু এ উদ্দেশ্যেই নয় যে, মু'মিনের খুদী শুধু তার ক্ষুধা-পিপাসা, যৌন আবেগ ও আরামপ্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এটাও তার উদ্দেশ্য নয় যে, সে নফস ও দেহের উপর শুধু এক রমযান মাসেই নিয়ন্ত্রণ রাখবে। প্রকৃতপক্ষে তার দাবী হলো নফসের এ তিনটি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী আক্রমণের মোকাবিলা করে সে তার সকল প্রকার আবেগ ও সকল প্রকার তাড়নার উপর নিয়ন্ত্রণকারী হবে। এভাবে তার মধ্যে এতটা শক্তি হবে যে, শুধু রমযান মাসেই নয় বরং রমযানের পরেও অবশিষ্ট এগার মাসেও সে প্রতিটি খিদমতের জন্য নিজের দেহ ও এর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে, যা আল্লাহপাক তার জন্য ফরয করে দিয়েছেন, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের চেষ্টা করতে পারে যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে, প্রতিটি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে যা আল্লাহ অপসন্দ করেন। নিজের প্রবৃত্তির তাড়না ও আবেগকে আল্লাহর নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে। তার লাগাম নফসের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না যে, সে যেদিকে চাবে তাকে টেনেহেঁচড়ে বেড়াবে, বরং ক্ষমতার লাগাম থাকবে তার নিজের হাতে। নফসের যেসব কামনা-বাসনা যে সময় সে সীমা পর্যন্ত এবং যেভাবে পুরা করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, সেগুলোকে সে নিয়মানুযায়ী পুরা করবে। তার ইচ্ছাশক্তি এতটা কমজোর হবে না যে, ফরযকে ফরযও জানে এবং তা আদায়ও করতে চায়, কিন্তু দেহের উপর তার কর্তৃত্বই চলে না। দেহের রাজত্বে সে এমন শক্তিশালী শাসকের মতো অবস্থান করবে যে, তার অধীনস্থ আমলা দিয়ে সবসময় তার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করাতে পারে। এ শক্তি

সৃষ্টি করাই রোযার মূল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রোযার দ্বারা এ শক্তি হাসিল করেনি, সে অযথাই নিজেকে পানাহার বর্জনের ও রাত জাগার কষ্ট দিয়েছে।

কুরআন ও হাদীস উভয়টিই এসব কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, তাকওয়ার গুণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। হাদীসে রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও মিথ্যার উপর আমল করা ত্যাগ করেনি, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন নেই। নবী করীম (স) আরো এরশাদ করেছেন, এমন অনেক রোযাদার আছে, যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারে না।

–(৫ জুলাই, ১৯৪৮ইং)

কুরবানীর ঈদ

উৎসব অনুষ্ঠান এবং মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যখন থেকে মানুষ এ পৃথিবীতে সামাজিক জীবন শুরু করেছে, খুব সম্ভব তখন থেকেই উৎসব পালনের ধারা চলে আসছে। এমন কোনো জাতি দুনিয়াতে নেই এবং কখনো ছিলো না, যারা বছরে দু' চার অথবা পাঁচ-দশ দিন উৎসব আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট করেনি। এ উৎসব আয়োজন প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রাণ। এক জায়গায় মানুষের জমা হওয়া, অভিন্ন আবেগের প্রদর্শনী করা, মিলেমিশে আনন্দ উৎসব করা, একই ধরনের নির্দিষ্ট রীতিনীতি পালন করা, এগুলো নিজেদের মধ্যে আঠার মতো বৈশিষ্ট্য রাখে, যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পর মিলেমিশে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলে। এতে সামগ্রিক রূহই সৃষ্টি হয় না বরং সামান্য বিরতির পরপর রূহ তাজা ও জাগ্রত হয়।

সাধারণত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে যেসব পালা পার্বণ উদযাপন করা হয়, তা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, প্রতিটি পর্বই হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে উদযাপন করা হয়, অথবা তা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত অথবা কোনো বিশেষ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। মোটকথা উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য কোনো না কোনো উপলক্ষ অবশ্যই প্রয়োজন, যা একটি জাতির ব্যক্তিবর্গ অথবা দেশের বাসিন্দাদের সমভাবে আগ্রহের ব্যাপার হয় এবং এর সাথে এদের সকলের আবেগ অনুভূতিও জড়িত থাকে। এ কারণে একটি জাতির বা দেশের পর্বের ব্যাপারে অপর কোনো জাতি বা দেশ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে না। আর কোনো কল্যাণের কারণে নিসংকোচে আগ্রহ প্রকাশ করতে চাইলেও তা করতে পারে না। কারণ একটি জাতির আচার অনুষ্ঠান যে উৎস থেকে উৎসারিত হয় অপর কোনো জাতির আবেগ অনুভূতিতে তা সাড়া জাগাতে পারে না, যেভাবে ঐ জাতির মধ্যে সাড়া জাগাতে পারে। উৎসব পালনের পন্থা বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন রকম। কোথাও শুধু খেলাধুলা, আমোদফূর্তি, হাসি তামাশার মধ্যেই আচার অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকে, কোথাও আবার আনন্দ আহলাদ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে অশ্লীলতা ও অভদ্রতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোথাও আবার মার্জিত আনন্দ অনুষ্ঠানের সাথে কিছু পরিপাটি রসম রেওয়াজও পালন করা হয়। আবার কোথাও এসব সামষ্টিক অনুষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে মানুষের মধ্যে উন্নত পর্যায়ের নৈতিক

শক্তি সৃষ্টি এবং কোনো উন্নত আদর্শের সাথে মহব্বত ও বন্ধনের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। মোটকথা কোনো একটি জাতির পালা পার্বণ পালনের পদ্ধতি যেনো একটি তুলাদণ্ড, যার সাহায্যে আপনি তাদের মেজাজ, তাদের শক্তি, তাদের আশা ভরসার পরিমাপ সহজেই করতে পারেন। একটি জাতির চারিত্রিক ও নৈতিক মান যত উন্নত হবে, তার আচার অনুষ্ঠানও ততই মার্জিত ও পবিত্র হবে। আবার নৈতিক মান অনুসারে একটি জাতি যত অধঃপতিত হবে, তার আচার অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারেও ঠিক ততটাই গর্হিত দৃশ্য পেশ করবে।

ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন সংস্কার আন্দোলন যা কোনো নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং গোটা দুনিয়ার মানুষকে এক আল্লাহর গোলামী ভিত্তিক সংস্কৃতির অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এ জন্য যেখানে সে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে নির্দিষ্ট একটা ছাচে ঢেলে সাজিয়েছে, সেখানে আচার অনুষ্ঠানগুলোকেও একটি নতুন রূপদান করেছে, যা গোটা দুনিয়ার পূজা পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠান থেকে ভিন্ন। সামাজিক জীবনে উৎসব অনুষ্ঠানের যে গুরুত্ব রয়েছে এবং সমাজে সামষ্টিক আনন্দ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে একটা স্বভাবসুলভ পিপাসা লক্ষ্য করা যায়, তাকে তো ইসলাম উপেক্ষা করেনি বরং তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা পালনের পদ্ধতি এবং এর নৈতিক প্রাণসত্তায় বুনিয়াদী পরিবর্তন এনেছে। এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

(১) একটি বিশ্বজনীন আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান ও পালা পার্বণ সুনজরে দেখতে পারে না। যেসব পর্বের বুনিয়াদ পৃথক পৃথক জাতির প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, যার সাথে একটি সম্প্রদায়ের আবেগ ও আগ্রহ জড়িত এবং যাতে একটি সম্প্রদায় আর একটি সম্প্রদায়ের সাথে স্বভাবতই শরীক হতে পারে না, তা মূলত মানবতার জাতিগত পার্থক্য ও বিভক্তিকে মজবুতকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। এ ধরনের পর্ব যেভাবে একটি সম্প্রদায়কে নিজেদের মধ্যে সুসংগঠিত হতে সাহায্য করে তদ্রূপ তা প্রতিটি জাতিকে অন্য জাতি হতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করার ভূমিকাও পালন করে।

অতএব এমন কোনো আন্দোলন যা জাতীয়তাবাদের উর্ধে যা মানবতার জন্য কাজ করে এবং গোটা বিশ্বের মানুষকে একটি সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, সেই আন্দোলন এ ধরনের পালা পার্বণকে গ্রহণ

করাতো দূরের কথা তাকে পসন্দও করতে পারে না। কারণ তা তার উদ্দেশ্যের পথে কার্যত একটি বাধা স্বরূপ। তার সামনে উদ্দেশ্যের স্বাভাবিক দাবী হলো, যেসব সম্প্রদায় তার প্রভাবাধীন আসবে তার থেকে সাম্প্রদায়িক পালা পার্বণ পরিত্যাগ করাবে এবং তদস্থলে এমন আচার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট করবে, যাতে তারা সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেগুলো একসাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকও হবে, যার ভিত্তি কোনো জাতীয় প্রচলিত প্রথা বা আবেগের উপর হবে না, বরং মানবতার অভিন্ন গুরুত্বের অধিকারী আবেগ অনুভূতি ও রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২) আবার যে আন্দোলন বিশ্বজনীন হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর দাসত্ব ভিত্তিকও তা এমন কোনো পালা পার্বণ পসন্দ করে না, যাতে শিরক ও সৃষ্টিপূজা এবং মুশরিকী ধ্যান-ধারণার সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায়। সে তার মিশনের আসল প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী এতে অপারগ। আর এ স্বভাবের কারণেই যে যে দেশে ও জাতিতে তার প্রভাব পড়বে সেখানেই তাদের পুরনো ধর্মীয় পর্বকে এবং তাদের পুরাতন বিশ্বাসকে পুনর্জীবিতকারী আচার অনুষ্ঠানকে বন্ধ করে দিতে এবং তদস্থলে এমন সব আচার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য, যা আল্লাহর আনুগত্যের গভীর রঙে রঞ্জিত।

(৩) আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে নৈতিকতারও একটা উন্নত লক্ষ্য সৃষ্টি হয় এবং তার দাবী এই যে, আল্লাহর গোলামী ভিত্তিক একটি আন্দোলন তার অনুসারীদের জন্য এমন সব উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে যা অশ্লীলতা, পাপাচার ও নোংরামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। এখানে আনন্দ ফূর্তির প্রকাশ ঘটবে ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে যা কেবল রং তামাশাতেই শেষ হবে না, বরং ঐক্যবদ্ধ জীবনে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে উন্নত নৈতিক উদ্দেশ্যে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হবে।

ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য যেসব উৎসবের ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই দৃষ্টিগোচর হয়। আরব, ইরান, মিসর, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে যেসব জাতি ইসলাম কবুল করে, তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও জাতীয় পর্বগুলোকে ইসলাম বর্জন করেছে এবং এর পরিবর্তে দুটি উৎসবের আয়োজন করেছে। এ দুটি উৎসব হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা (রমযানের ঈদ, কুরবানীর ঈদ)। এ দুটির প্রথমটি এ আনন্দ প্রকাশের জন্য পালন করা হয় যে, আল্লাহর নামে দীর্ঘ একমাস সিয়াম

সাধনার যে হুকুম আমাদের দেয়া হয়েছিলো তা সঠিকভাবে পালন করতে আমরা সফল হয়েছি। অতএব এ নির্দেশ পালন শেষে আমরা নিজেদের মালিকের নিকট শোকর আদায় করি। এখন বাকী রইলো দ্বিতীয় উৎসব। এ উৎসবতো সেই নজীরবিহীন কুরবানীর স্মৃতির স্মারক, যা আজ থেকে চার হাজার বছর আগে আল্লাহর এক নিবেদিত বান্দা নিজের মালিকের নিকট পেশ করেছিলেন। এ দুটো অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, এর সাথে বিশেষ কোনো জাতীয়তা বা জন্মভূমির (দেশের) সম্পর্ক নেই। বরং তাতে এমন জিনিসকে উৎসবের বুনিয়াদ বানানো হয়েছে যার সাহায্যে দুনিয়ার সকল আল্লাহর দাসত্ব কবুলকারী মানুষের আবেগ অনুভূতি এক সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এভাবে দুটো অনুষ্ঠানেই আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ ইবাদাতের গভীর রং পরিলক্ষিত হয়। কোনো প্রকারের ব্যক্তিপূজা (HERO WORSHIP) অথবা কোনো সৃষ্টির পূজার সামান্যতম চিহ্নও আপনি খুঁজে পাবেন না। আবার এসব উৎসব উদযাপনের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাও এত পবিত্র যে, এর চেয়ে বেশী ভদ্র, মার্জিত ও নৈতিক উপকারিতায় পরিপূর্ণ পদ্ধতি ধারণায়ও আসতে পারে না। পরবর্তীকালের মুসলমানগণ ইসলামী উৎসবের (ঈদের) আসল শানশওকতকে অনেকাংশে জাহেলিয়াতের অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কালিমালিপ্ত করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে ঈদ যেভাবে উদযাপন করা হতো তার চিত্র আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যার সাহায্যে আপনি এ অনুষ্ঠানের পবিত্রতা সঠিকভাবে অনুমান করতে সক্ষম হবেন।

ঈদের দিন ভোরে মুসলিম নর-নারী শিশুকিশোর সকলেই গোসল করতেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ অনুযায়ী ভালো ভালো পোশাক পরিধান করে ঈদের মাঠে সমবেত হওয়ার জন্য বের হতেন। রমযানের ঈদে নামায পড়তে যাবার আগে সচ্ছল অবস্থার সকল মানুষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের সামগ্রী অথবা এর সমমূল্যের অর্থ গরীব দুঃখীদেরকে দান করতেন, যেন কোনো লোক এ ঈদের দিনে ভুখা না থাকে। পক্ষান্তরে কুরবানীর ঈদে নামায আদায় করার পর ঘরে ফিরে এসে কুরবানীর পশু জবেহ করে এর গোশত বন্টন করা হতো। বেলা একটু উপরে উঠার সাথে সাথে সকল মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তো। সংখ্যার প্রাচুর্য দেখিয়ে মুসলমানদের শান শওকত প্রকাশের জন্য আল্লাহর নিকট সকলে মিলে দোয়া করার জন্য এবং এই সম্মিলিত উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবার জন্য নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোরসহ একত্রে ঘর থেকে

বেরিয়ে পড়ার হুকুম ছিলো। ঈদের নামায মসজিদের পরিবর্তে জনবসতির বাইরে কোনো খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হতো, যাতে লোকসমাগত খুব বেশী হতে পারে। নামাযে যাবার পথে সকল মুসলমান নিম্নোক্ত তাকবীর বলতে বলতে অগ্রসর হতেন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।"

প্রতিটি অলি গলি, মহল্লা, বাজার ও প্রধান প্রধান সড়ক এ শ্লোগানে প্রকম্পিত হত, ফলে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে উঠতো।

ঈদগাহে সকল লোক একত্রিত ও সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রাসূলের ইমামতিতে যথারীতি দু' রাকায়াত নামায আদায় করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে 'খুতবা' (ভাষণ) দিতেন। জুময়ার নামাযের বিপরীতে এ 'খুতবা' নামায শেষে দিতেন। এতে অধিকাংশ মানুষ তাদের নেতার এ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের সময় উপস্থিত থাকার সুযোগ পেতেন। কারণ এ ধরনের সুযোগ বছরেতো মাত্র দু বারই আসতো। প্রথমে একটি বক্তব্য পুরুষদের সামনে পেশ করা হতো। এরপর আল্লাহর রাসূল (স) তাশরীফ নিতেন ময়দানের সেই অংশে যেখানে মহিলাগণ সমবেত হতেন। সেখানেও তিনি বক্তব্য পেশ করতেন। তালীম, তালকীন, ওয়ায নসীহত ছাড়াও ইসলামী জামায়াত সম্পর্কে ও সময়ের দাবী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরেও আলোকপাত করা হতো। কোনো সামরিক বা রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের ব্যবস্থাও সেখানে এই সম্মেলনেই করা হতো। মুসলিম জামায়াতের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতিও লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো এবং প্রতিটি মানুষ তা পূরণ করার জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী এতে অংশগ্রহণ করতেন। এমন কি কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, নারীরাও এসব সময়ে তাদের প্রিয় অলংকারাদিও শরীর থেকে খুলে আল্লাহ ও মুসলিম জামায়াতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন।

এরপর ঈদগাহের এ সম্মেলন থেকে বাড়ী ফেরার পালা। হুকুম ছিলো, যে পথে ঈদগাহে আসা হয়েছে তার পরিবর্তে অন্য রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ হতে বাড়ীর দিকে ফিরে যাও, যাতে জনবসতিতে তোমাদের আনন্দ উৎসব ও আল্লাহু আকবার ধ্বনির গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।

নামায শেষে বাড়ী ফিরে ঈদুল আযহার দিন সামর্থবান সকল মুসলমান কুরবানী করতেন। এই কুরবানীর উদ্দেশ্য সেই ঘটনাকে শুধু স্মরণ করাই ছিলো না, বরং সেই আবেগ ও অনুভূতিকেও তাজা তপ্ত করে তোলাও উদ্দেশ্য ছিলো, যার সাথে ইরাকের অধিবাসী একজন বিদেশী বৃদ্ধ মানুষ মক্কায় আল্লাহপাকের ইশারা পেয়েই নিজের ছেলেকে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। আর ঠিক ঐ সময়েই আল্লাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাঁকে পুত্রের পরিবর্তে মেষ কুরবানীর অনুমতি দিয়ে দিলেন। ঠিক এ তারিখে এ সময়েই গোটা বিশ্বের সকল মুসলমান কার্যত সেই কাজটি করে সেই আবেগ অনুভূতিকে তাজা করে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মতো তারাও আল্লাহর অনুগত বান্দা। তাঁর মতো এরাও নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিসহ প্রতিটি জিনিস আল্লাহর হুকুমে তাঁর ভালোবাসায় উৎসর্গ করে দেবার জন্য প্রস্তুত এবং তাদের জীবন মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য নিবেদিত, এ কুরবানীর মাধ্যমে তারা এ কথারই প্রমাণ দেয়। এ উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটে পশু যবেহ করার মাধ্যমে এবং কুরবানীর সময় পঠিত বাক্য থেকে,

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

"আমি সেই সত্তার দিকে আমার চেহারা নিবদ্ধ করেছি, যিনি আকাশ জগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি হুবহু সেই পন্থার অনুসারী, যা ছিলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদ্ধতি। আমি আল্লাহর সাথে শরীককারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, সবকিছুই বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যার কোনো শরীক নেই। এ কাজেরই আমাকে হুকুম করা হয়েছে এবং আমি আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! এ সম্পদ আপনারই দান। আপনার সমীপেই তা হাজির করেছি, 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার'।"

এ শব্দমালা মুখে উচ্চারণ করতে করতে কুরবানীর পশু জবেহ করা হতো। পরিবারের মহিলাগণ ও শিশু-সন্তানসহ সকলে মিলেই এই দৃশ্য অবলোকন করতেন। এ দৃশ্য থেকে তাঁদের সকলের হৃদয়ে যেন ওই কুরবানী আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের ভাবধারায় দীপ্ত হয়ে উঠে। অতপর এ গোশত গরীব মিসকীন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো। এর একটি অংশ পরিবারের লোকজনের জন্যও রেখে দেয়া হতো। কুরবানীর পশুর চামড়া অথবা এর মূল্য গরীব লোকদের দিয়ে দেয়া হতো। এসব ছাড়াও অন্তরের দরজা খুলে দান খয়রাত করা হতো। এ সবের উদ্দেশ্য ছিলো ঈদ অনুষ্ঠান যেন শুধু ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। ব্যস এই ছিলো ঈদ যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে উদযাপন করা হতো। এসব সরকারী রসমরেওয়াজ ছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে যুবক শ্রেণী কিছু খেলাধুলাও করতো এবং বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা কিছু আনন্দগীতের আয়োজনও করতো। কিন্তু এসব কাজের একটা সীমা ছিলো। এর চেয়ে বেশী কিছু করার কোনো হুকুম ছিলো না। বরং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাতো যুবকদের বৈধ ও মার্জিত কাজে অংশ নেয়া হতেও বিরত থাকতেন। কারণ, তারা যেন এসব কাজ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে নাজায়েয কিছু করার সাহস না পায়।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত একটি ঘটনা হতে এসব ব্যাপারে নেতৃস্থানীয়দের অনুসৃত কর্মপন্থা কি ছিল সে সম্পর্কে আমরা আন্দাজ করতে পারি। একবার ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ (স) নিজের বাসগৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট দুটি মেয়ে বসে গান গাইছে। এসব গান কিন্তু প্রেম ভালবাসা বিষয়ে ছিলো না, বরং তা ছিল বুআছ যুদ্ধের সঙ্গীত। আর বালিকা দুটোও সঙ্গীত শিল্পের পেশাদার গায়িকা ছিল না। বরং তারা ছিল ঘরের কন্যা। এরা কখনো কখনো মনের আনন্দে একত্রে বসে নিষ্পাপ নিরুত্তাপ গীতসঙ্গীত গাইতো। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের এ আনন্দ উল্লাসের কোনো পাত্তা না দিয়ে চুপচাপ এক কোণায় গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে হযরত আবু বকর (রা) এলেন এবং কন্যা আয়েশাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহর ঘরে এসব কি শয়তানী কাজ হচ্ছে! আবু বকর (রা)-এর গলার শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ (স) মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললেন, তাদের এ অবস্থায় থাকতে দাও। প্রত্যেক জাতির একটি ঈদ আছে। আজ আমাদের ঈদ। হুজুরের এ এরশাদ শুনে হযরত আবু বকর (রা) খামুশ হয়ে গেলেন। কিন্তু গানের ধারা অব্যাহত রইলো না। তাঁর

পিঠ ফিরতেই হযরত আয়েশা (রা) ওই মেয়েদেরকে চোখের ইঙ্গিত দিলেন। আর অমনি তারা নিজ নিজ ঘরে চলে গেলো। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যুব সমাজের নিষ্পাপ খেলাধুলা ও কিছু গানকে জায়েয মনে করা হয়, কিন্তু বয়স্ক মুরব্বিগণ এতে অংশগ্রহণ করে তাদের সাহস ও দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে দিতো না। পরবর্তীকালে নেতৃস্থানীয় মুরব্বিগণ এ সীমার সংরক্ষণে অমনোযোগী হয়ে পড়লে রশি ঢিল হতে লাগলো। আর এভাবে হতে হতে নাচগান ও বাদ্যবাজনার সব বেড়া পার হয়ে ব্যাপার এখন বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

কুরবানী

আজ থেকে চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাক ভূমিতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি মানব ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য নিজের একটি স্বতন্ত্র স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন। যে সময় তিনি চোখ খুলেন, তখন গোটা বিশ্ব শিরক ও মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত ছিল। যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তারা ছিল তারকাপূজক জাতি। চাঁদ, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র ছিল তাদের মাবুদ এবং শাহী খান্দান এসব মাবুদের সন্তান হওয়ার দাবীতে দেশবাসীর খোদা হিসেবে মান্যবর ছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিলো পুরোহিত পরিবারে, যারা নিজ জাতিকে নক্ষত্র পূজার জালে জড়িয়ে রাখার মূল দায়িত্ব পালন করে।

এরূপ যুগে, এরূপ জাতিতে এবং পরিবারে এ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যদি দুনিয়ার গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার মতো লোক হতেন, তাহলে তিনিও তার খান্দানের লোকদের মতো, দেশের লোকদের মতো তাই করতেন। দৃশ্যত অন্য কোনো দিকে পথ দেখাবার কোনো আলোক তখন কোথাও বিদ্যমান ছিলো না। অন্য কোনো পথের চিন্তা মনে উদ্রেক না করাই ছিলো তাঁর নিজের ও খান্দানের স্বার্থ রক্ষার দাবী। কেননা এ খান্দানের ধর্মের ব্যবসাতো এ নক্ষত্র পূজার ছত্রছায়ায় জোরেশোরে চলছিলো। কিন্তু তিনি অচেতন ও অবুঝ লোক ছিলেন না যে, বাতাসের গতি যে দিকে তিনিও সেদিকে খরকুটার ন্যায় উড়তে থাকবেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে জাতীয়তার উপর পিতৃপুরুষের এবং জাতির রীতিপদ্ধতিকে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। বুদ্ধি হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তাঁর জাতি-গোষ্ঠী, আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি পদ্ধতির উপর নিজেদের জীবনপ্রাসাদ রচনা করেছিল তা সঠিক কিনা, জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষের সাথে এটা অনুসন্ধান করা তিনি দরকার মনে করেছেন। এ স্বাধীন অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই তিনি শিশুকাল থেকে শুনে আসা চাঁদ, সূর্য ও গ্রহ তারাসহ মা'বুদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। প্রতিটিকে যাচাই বাছাই করে দেখেছেন যে, এদেরকে খোদা বলার ধারণা কতটুকু সঠিক। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, না এরা মা'বুদ নয় বরং সকলেই বান্দাহ। মা'বুদতো শুধু তিনিই হতে পারেন, যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন।

এ সত্য তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তিনি সেইসব লোকদের মতো আচরণ অবলম্বন করতে পারলেন না, যারা একটি কথাকে সত্য বলে

জানা ও বুঝার পরও তা গ্রহণ করে না। তিনি সত্যকে সত্য জানার পর তা মানতে একটি মুহূর্তও দেরী করলেন না। সাথে সাথেই তিনি স্বীকার করে নিলেন, "আমি আমার মস্তক অবনত করলাম সেই আল্লাহর সামনে, যিনি আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিকারী।" এ স্বীকৃতির সাথে সাথে তিনি তাঁর ভাই, বন্ধু ও জাতির নিকট ঘোষণা করে দিলেন, আমার জীবন পথ তোমাদের জীবন পথ থেকে আলাদা। এ শির্ক ও মূর্তিপূজার ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথে নেই। এটাই ছিল ওই ব্যক্তির প্রথম কুরবানী। এটাই হলো তাঁর প্রথম ছুরি চালানো যা তিনি পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুকরণ, বংশীয় ও জাতীয় গোঁড়ামীর উপর এবং প্রবৃত্তির সেই সব দুর্বলতার উপর চালিয়েছেন, যার কারণে মানুষ নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে একটি রাস্তায় এ জন্য চলে যে, ভাই বেরাদার, জাতি এবং গোটা দুনিয়া এ পথেই চলছে।

এ স্বীকৃতি ও ঘোষণার পর এ ব্যক্তি নীরব বসে থাকেননি। তাঁর নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, এ বিশ্ব চরাচরের আসল সত্য হলো 'তাওহীদ' এবং 'শিরক' একটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিষয়। এ সত্যকে জানার পর তিনি স্বয়ং এ কথাও জেনে গিয়েছেন যে, যেসব মানুষ তাওহীদের পরিবর্তে শিরকের আকীদা ও মুশরিকী নীতিমালার উপর নিজেদের ধর্ম, আখলাক ও তামাদ্দুনের ইমারত গড়ে তুলেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি কচি ডালের উপর বাসা তৈরি করে রেখেছে যা মোটেই টেকসই নয়। এ উপলব্ধি তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে এজন্য উঠে দাঁড়ালেন যে, নিজ জাতিকে শিরক হতে বিরত রেখে তাওহীদের দিকে ডাকতে হবে। তিনি জানতেন, জাতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্য প্রচারকার্য চালিয়ে তিনি নিজেই পুরোহিতের গদি হতে বঞ্চিত হবেন। তিনি এও জানতেন যে, এ খান্দান যদি জাতীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, তাহলে তাদের অর্জিত সকল প্রতাপ প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাঁর একথাও জানা ছিল যে, এ প্রচারকার্যের ফলে গোটা জাতি তাঁর উপর ক্রোধে ফেটে পড়বে। এটাও তাঁর অজ্ঞাত ছিলো না যে, এ প্রচার তাঁকে ক্ষমতাসীন শক্তির কোপদৃষ্টিতে নিক্ষেপ করবে। কারণ রাজ পরিবারের ক্ষমতার উৎসই ছিল এ আকীদা যে, তারা দেবতাদের সন্তান। এ কারণেই তাওহীদ অবশ্যম্ভাবীরূপে সে হুকুমতের বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথেই ছিলো সংঘর্ষশীল। এসব কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্তব্য পালনের জন্য উঠে পড়লেন, নিজের পিতাকে, নিজের খান্দানকে, নিজের জাতিকে, এমনকি রাজাকে পর্যন্ত তিনি শিরক থেকে বিরত থাকতে এবং তাওহীদের আকীদা কবুল করতে দাওয়াত দিলেন। এসব শক্তি যত

বেশী তার বিরোধিতা করতে লাগলো, তাঁর কর্মচাঞ্চল্যও তত বেশী বেড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত ফল এই দাঁড়ালো যে, একদিকে তিনি একা নিসঙ্গ আর অপর দিকে তাঁর মুকাবিলায় রাজশক্তি-দেশ-ভাই-বেরাদার, বংশ-পরিবার এমনকি তাঁর নিজের পিতা পর্যন্ত এক সারিতে এসে দাঁড়ালো। গোটা দেশে কেউ তার ভাই বন্ধু ছিল না, চারিদিকেই শত্রু আর শত্রু। সহযোগিতার কোনো আওয়াজ তার পক্ষে উঠার ছিলো না। এরপরেও যখন তিনি সাহস হারালেন না এবং তাওহীদের দাওয়াত দিতে তাঁর মুখ অবসন্ন হলো না, তখন সিদ্ধান্ত হলো সর্বসাধারণ্যে তাঁকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে। এ ভয়াবহ শাস্তির আশংকাও তাঁকে মিথ্যাকে মিথ্যা ও সত্যকে সত্য বলা হতে বিরত রাখতে পারলো না। তিনি আগুনের লেলিহান শিখায় নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পসন্দ করলেন, কিন্তু যে সত্যের উপর তিনি ঈমান এনেছেন তার থেকে বিরত থাকতে ও তাকে সত্য বলা ত্যাগ করতে তিনি পসন্দ করলেন না, এটা তাঁর দ্বিতীয় কুরবানী।

জানি না আল্লাহ কিভাবে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। এমন বিপজ্জনক অবস্থা থেকে নিরাপদে বেঁচে যাবার পর তাঁর পক্ষে এদেশে অবস্থান করা ছিলো অসম্ভব। অতপর দেশ থেকে বহিষ্কৃত জীবনই তিনি অবলম্বন করলেন। আশেপাশের যেসব দেশে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন, তারা সকলেই মূর্তিপূজক ছিলো। কোথাও এমন কোনো ছোটখাটো আত্মীয় বা সমাজ ছিলো না যারা তাওহীদের সমর্থক হতো, যাদের কাছে তিনি আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারতেন। এ পরিস্থিতিতে দেশত্যাগের পর তাওহীদের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকলেই শুধু নিরাপদ থাকা সম্ভব হতো। ব্যক্তি হিসেবে অপরিচিত একজন লোক কোনো ধর্মের অনুসারী হলে অন্য দেশের লোকেরা তাকে অযথা উত্যক্ত করার কষ্ট করতে যাবে কেন ? তার ধর্ম কি একথা জানারওতো তাদের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আল্লাহর এ বান্দা অন্য দেশে গিয়েও চুপ থাকলেন না। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই আল্লাহর সকল বান্দাদের এ দাওয়াতই দিলেন যে, অন্যের গোলামী পরিত্যাগ করো এবং শুধু এক আল্লাহরই গোলাম হয়ে থাকো, যিনি প্রকৃতই তোমাদের আল্লাহ। এ দাওয়াত ও তাবলীগের ফল এই দাঁড়ালো যে, নিজের দেশ থেকে বের হয়ে গিয়েও কোথাও শান্তিতে থাকা তাঁর নসীবে জুটলো না। কখোনো সিরিয়া গিয়েছেন তো কখোনো গিয়েছেন ফিলিস্তিনে, কখোনো মিসরে গিয়েছেন কখনো আবার হিজাযে। মোটকথা গোটা জীবনই তিনি দেশ দেশান্তরের মাটি যাঁচাই করে চলেছেন। তিনি

আরাম আয়েশ চাননি। তিনি ঘড়-বাড়ী, খেত-খামার, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিও লোভাতুর ছিলেন না। দুনিয়ার বিত্তবৈব ; জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সাজ-সরঞ্জাম তাঁর কাম্য ছিল না। তাঁর কাম্য ছিল শুধু একটিই যে সত্যের প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন তার কালেমা উড্ডীন হবে। মানবজাতি গোমরাহী ছেড়ে দিয়ে সেই সহজ-সরল পথে চলতে থাকবে, যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত। এ কামনাই তাঁকে দেশে দেশে ঘুরিয়ে ছেড়েছে। আর এ কামনার পেছনে তিনি তাঁর প্রতিটি স্বার্থকে কুরবানী করেছেন। এটাই হলো তাঁর তৃতীয় কুরবানী।

ঘর-বাড়িহীন ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে জীবন যখন শেষ হয়ে আসতে লাগলো, তখন আল্লাহ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। এ ছেলেকে তিনি লালন পালন করলেন। ছেলে এমন বয়সে পৌছল যে বয়সে সন্তান মা বাপের প্রয়োজনে কাজে লাগে ও জীবন সংগ্রামে তাদের সহযোগিতা করার উপযুক্ত হয়। ছেলে সেও আবারও একমাত্র ছেলে, তারপর আবার সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছে মাত্র। আর পিতাও জীবনের সেই স্তরে পৌছেছেন, যেখানে পৌছে মানুষ যুবক ছেলের সহযোগিতার সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থার কথা চিন্তা করলে অনুমান করতে পারবে যে, ঐ পিতার নিকট এই ছেলে কত প্রিয়। কিন্তু ইসলামের অর্থই হলো যে, তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর মর্জির চেয়ে অধিক আর কোনো জিনিস বেশী প্রিয় হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর এ বান্দা সারাটা জীবন আল্লাহর জন্য যেসব কুরবানী দিয়েছেন, তাকেও যথেষ্ট মনে করেননি। এ সবের পরও তাঁর সর্বশেষ পরীক্ষা নেয়া প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। আর সেই শেষ পরীক্ষা হলো, এ মুসলিম বান্দা নিজের কলিজার টুকরা ও মহব্বতকে আল্লাহর মহব্বতের উপর কুরবানী করতে পারেন কিনা ? বস্তুত এ পরীক্ষাও নেয়া হলো। বিশ্বজগত দেখেছে যে, এ বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের মা'বুদের প্রকাশ্যে হুকুম নয়, শুধু ইশারা পেয়েই একমাত্র যুবক ছেলেকে স্বয়ং নিজের হাতে জবেহ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এটা স্বতন্ত্র কথা যে, আল্লাহ যবেহর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছেলের পরিবর্তে দুম্বাকে কবুল করে নিয়েছেন। কেননা ছেলের রক্ত আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল না, ভালবাসার পরীক্ষাই শুধু ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহর এ সত্যবাদী বান্দা নিয়তের দিক থেকে নিজের কলিজার টুকরাকে আল্লাহর ইশারায় কুরবানী করেই দিয়েছিলেন। এটাই ছিলো সেই শেষ ও সবচেয়ে বড় কুরবানী যে কুরবানী আল্লাহর সেই বান্দা নিজের ইসলাম, ঈমান এবং আল্লাহর সাথে নিজের ওফাদারীর প্রমাণ হিসেবে পেশ

করেছিলেন। এতসব কুরবানীর বিনিময়ে আল্লাহপাক তাঁকে গোটাজাহানের মানবজাতির ইমাম বা নেতা বানিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের বন্ধুত্বের মর্যাদায় তাঁকে সৌভাগ্যবান করেছেন।

এখন চিন্তা করুন, এ কোন্ ব্যক্তির আলোচনা ? এ আলোচনা হলো সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বের, যাঁকে আজ আমরা 'হযরত ইবরাহীম (আ)' নামে জানি। আর এটা সেই কুরবানী, গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ পশু কুরবানীর মাধ্যমে যার স্মরণ উৎসব পালন করে থাকে। আর এ স্মরণ উৎসব পালনের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের ত্যাগ ও কুরবানীর সেই রূহ, ইসলাম, ঈমানের সেই অবস্থা এবং আল্লাহর সাথে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সেই আবেগ সৃষ্টি করা, যা হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর গোটা জীবনে দেখিয়ে গেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি একটি পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়, কিন্তু তার হৃদয়ে সেই রূহ সৃষ্টি না হয়, তাহলে সে অন্যায়ভাবে একটি পশুর রক্ত ঝরালো। আল্লাহর কোনো রক্ত ও গোশতের প্রয়োজন নেই। সেখানে যে জিনিসটি কাম্য প্রকৃতপক্ষে তাহলো, যে ব্যক্তি কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর উপর ঈমান আনবে, সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সত্য ও খাঁটি বান্দাহ হয়ে থাকবে। কোনো গোত্রীয় আকর্ষণ, কোনো বিশেষ পসন্দ, কোনো ব্যক্তিস্বার্থ, কোনো চাপ ও লোভ, কোনো ভয় ও ক্ষতি, মোটকথা কোনো ভেতরের দুর্বলতা ও বাইরের শক্তি তাকে সত্যের পথ থেকে সরাতে পারবে না। আল্লাহর গোলামী স্বীকার করে নেবার পর সে আর কারো গোলামী স্বীকার করবে না। তাঁর জন্য যে কোনো ধরনের সম্পদ কুরবানী করে দেয়া সহজ, কিন্তু সেই সম্পর্ক কুরবানী করা কোনো মতেই সম্ভব নয়, যে সম্পর্ক সে তাঁর আল্লাহর সাথে কায়েম করে রেখেছে। এ কুরবানীই ইসলামে আসল সত্য এবং আজ সকল যুগের চেয়ে আমরা এরই বেশী মুখাপেক্ষী যে, এই সত্য আমাদের বিশ্বাসে ও কর্মে বদ্ধমূল হতে হবে। এ বিশ্বে মুসলমানগণ যখনই কোনো হোচট খেয়েছে ইসলামের এ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েই তা খেয়েছে।

–(অক্টোবর, ১৯৪৭ ঈসায়ী)

ধর্মীয় রাষ্ট্র

[এটা একটা প্রশ্নোত্তর আকারে আলোচনা, যা ১৯৪৮ সালের মে মাসে রেডিও পাকিস্তান, লাহোর থেকে প্রচারিত হয়েছিলো। এ আলোচনায় প্রশ্নকারী হিসেবে জনাব ওজীহুদ্দীন প্রশ্ন করছেন, আর মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) তার জওয়াব দিচ্ছেন।]

প্রশ্ন ঃ এ আলোচনা শুরু করার আগে খুব সম্ভব একথা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, আপনার চিন্তায় ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা কি আছে ?

উত্তর ঃ স্পষ্ট কথা এই যে, একজন মুসলিম যখন 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করবে, তখন তার মনে এর অর্থ 'ইসলাম'ই ধরে নিতে হবে। আমি যখন বলি পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া উচিত, তখন আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হতে হবে। অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট্র যা আখলাক, তাহজীব, তামাদ্দুন সামাজিকতা, আইন-কানুন, রাজনীতি ও অর্থনীতির সেই সব নীতিমালার উপর কায়েম হবে, যা ইসলাম আমাদেরকে দান করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি ধর্মীয় রাষ্ট্রের যে ধারণা পেশ করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে থাকবে। সে শ্রেণীর কাজ হবে তারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুসন্ধান করবে, রাষ্ট্রীয় আইন কানুন তৈরি করবে এবং শরয়ী হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক কারা হবে ? এ কথাতো আপনার জানাই আছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতিটি শ্রেণী নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ধর্মীয় সমর্থন খুঁজবে এবং ধর্মীয় শ্লোগান দিবে। দীনের বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণ এ শ্রেণীগত সংঘাত থেকে নিরপেক্ষ ও সম্পর্কহীন থাকতে পারে না। তারা হয় নিজেদেরকে সাধারণ জনশক্তির সাথে রাখবে, অথবা নিজেদেরকে পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত করে নেবে। এ ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। এ অবস্থায় কুরআনের নীতিমালার যে ব্যাখ্যাই পেশ করা হবে, তা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতেই করা হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক খেয়াল

পোষণকারী মুফাসসিরগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশ মতবিরোধ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক বিরোধ একটি সুদীর্ঘ ফিক্হী বিতর্কের রূপ ধারণ করবে। আর যেসব সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান তালাশ করে বের করা অতীব প্রয়োজনীয় সেগুলোর ব্যাপারে শুধু কালক্ষেপণ হতে থাকবে।

উত্তর ঃ যে শ্রেণী সংঘাতের দিকে আপনি ইংগিত করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে এ জন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, শত শত বছর থেকে অনৈসলামী প্রভাব প্রতিপত্তির অধীনে থাকতে থাকতে আমাদের সমাজ ও আখলাক সেই রূহ এবং ইনসাফের সেই নীতিমালা হতে বঞ্চিত রয়ে গেছে, যা ইসলাম আমাদের দান করেছিলো, যে ভোগবাদ দুনিয়ার অন্যান্য সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করেছে, দুর্ভাগ্যবশত তাই আমাদের সমাজকে বিভক্ত করতে এবং আমাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে লিপ্ত করার হুমকি দিচ্ছে। কিছুকাল পূর্বেও আমরা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিণতিতে ভুগেছি এবং তার যখম এখনো শুকায়নি। আমরা এখন এজন্য তৈরি নই যে, নিজেরা নিজেদেরকে সেই সমাজবাদী দর্শনের হাতে সোপর্দ করব, যে দর্শন আমাদের মধ্যে আর একটি যুদ্ধ ও শ্রেণীসংঘাত বাঁধিয়ে দেবে এবং আমাদেরকে সেই সময় পর্যন্ত স্বস্তির অবস্থা দেখতে দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়। অন্যান্য জাতিগুলোতো এ সমাজবাদী দর্শনকে সম্ভবত এ জন্যে কবুল করেছে যে, তাদের নিকট আখলাক ও সেই নীতিমালা মওজুদ ছিল না, যা শ্রেণীগত স্বার্থের উন্নতি ও অগ্রগতি রুখতে পারতো এবং বিভিন্ন উপকরণকে একটি ইনসাফপূর্ণ ভ্রাতৃত্বে একত্রিত করে দিতে পারতো। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমরা এমন এক জীবন ব্যবস্থার মালিক যা আমাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। প্রয়োজন শুধু একটি কাজের। সে কাজটি হলো আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যকার সেই সব লোকদের উৎসাহিত করি, যারা ইসলামের প্রাণশক্তিকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং শ্রেণীগত গোঁড়ামীর উর্ধে থেকে ইসলামের সর্বসম্মতভাবে অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে আমাদের সামনে যে ব্যাখ্যা পেশ করবে, তাই আমরা সকলে মেনে নিবো এবং আমাদের মধ্যকার কোনো শ্রেণী নিজের স্বার্থের অনুকূলে কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে যেন জেদ না ধরে। এসব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা গোটা জাতিকে সামাজিকভাবে করতে হবে। কোনো একটি শ্রেণী অথবা কিছু শ্রেণীকে আমরা এ ধরনের নির্বাচনের

ব্যাপারে শুধু এ মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখবো যে, তারা নির্ভরযোগ্য সীরাতের অধিকারী এবং ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দেবার যোগ্য কিনা।[১]

প্রশ্ন ঃ আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তির ধারণায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শুধু নিষ্ঠা ও ঈমানদারী যথেষ্ট নয়। এ সময় আমাদের সামনে অনেক জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি আছে। এসব ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। উৎপাদনের উপায় উপকরণ জাতীয় মালিকানায় থাকবে নাকি ব্যক্তি মালিকানায় ? দেশে একটিই রাজনৈতিক দল থাকবে, না একাধিক দল হওয়া গণতন্ত্রের জন্য জরুরী ? শ্রমিকদের হরতাল করার অধিকার থাকবে কিনা ? এ ধরনের অনেক সমস্যা। এসব জটিল বিষয়গুলোকে আপনি ধর্মীয় নেতাদের নিকট সোপর্দ করে দেখুন, তারা কোনো সিদ্ধান্তকারী মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, রাষ্ট্র গঠনের জন্য ফিকহ্‌ভিত্তিক গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং ধর্মীয় কিতাবাদি পর্যালোচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ উত্তমরূপে আমাদের পথপ্রদর্শন করতে পারেন।

উত্তর ঃ আপনি যখন 'ধর্মীয়' কথাটি বলেন সম্ভবত 'পার্থিব' কথাটি এর বাইরে রাখেন। এ কারণে সঙ্গতভাবেই আপনার মনে সন্দেহ জেগেছে যে, আমরা যদি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এ সকল ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের নিকট পেশ করি যারা পার্থিবতার কোনো খবর রাখেন না, তাহলে আমাদের এসব সমস্যা সমাধান হতে পারবে না। কিন্তু আপনি এ দিকটি সম্পর্কেও একটু চিন্তা করুন যে, আমরা যদি আমাদের তামাদ্দুন, আমাদের রাজনৈতিক এবং আমাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলো ঐসব 'পার্থিব বিশেষজ্ঞদের' যিম্মায় ছেড়ে দেই, যারা পাশ্চাত্য দর্শন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং ইসলামী শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছব ? আপনি বলেন যে, এসব লোক

১. সময়ের স্বল্পতার জন্য প্রশ্নকর্তাকে তার এ সন্দেহের পূর্ণ জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি যে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করা কোনো বিশেষ শ্রেণীর কাজ। প্রশ্নকারীর এ সন্দেহটি 'খৃষ্টীয় ধর্মরাজ্যে' 'পোপবাদ' এবং পুরোহিততন্ত্র হতে সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্ণ জবাব রেডিওর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেয়া সম্ভব ছিল না। এখানে আকারে ইঙ্গিতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের জনসাধারণ নিজেদের ভোটে নির্বাচিত করবেন এবং নির্বাচনী বাছাই তাদের নৈতিকতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হবে, কোনো শ্রেণী সদস্য হিসেবে নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের সংকলিত 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রথম খণ্ড ইসলামী পাবলিকেশন্স লিঃ লাহোর, পাঠ করুন।

ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের তুলনায় আমাদের উত্তমরূপে পথপ্রদর্শন করতে পারবে। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, তাদের এ পথপ্রদর্শন আমাদেরকে সেই মঞ্জিলে পৌঁছে দেবে, যেখানে আজ দুনিয়ার বড় বড় জাতি গিয়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ঘরের ভিতরে শ্রেণীস্বার্থে সংঘাত এবং ঘরের বাইরে আন্তর্জাতিক স্বার্থসিদ্ধির টানাপোড়েন। এর থেকে আমাদের জন্য কি এটাই উত্তম নয় যে, আমরা এমন লোক অনুসন্ধান করবো, যারা দীন ও দুনিয়া উভয়ই উত্তমরূপে জানে। যারা কুরআন হাদীসের শিক্ষা এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে পারদর্শী এবং জাতীয় সমস্যাদির ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে এমন সমাধান দেবেন, যা গোটা বিশ্বের অনুকরণযোগ্য নমুনা হবে।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী শরীআত মোতাবেক গঠন করা এবং বর্তমান অবস্থায় ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমাদের আরো একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কোনো কোনো সময় আমরা ধর্মীয় বিধানসমূহের স্পিরিট ভুলে যাই এবং এর শাব্দিক অনুকরণই আমাদের দৃষ্টির সামনে থাকে। এভাবে উপকরণ ও উদ্দেশ্য পরস্পরের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। সুদের কথাই ধরুন। সুদ নাজায়েয করার উদ্দেশ্য ছিলো অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা। অনুরূপভাবে ইজারাদারী, মজুতদারী, চোরাচালানীরও বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখা হয়েছে। কারণ পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা তখনও শৈশব অবস্থায় ছিল এবং শিল্প পুঁজির ন্যায় যুলুম-নিপীড়নের হাতিয়ার ছিল না। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ হচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং অন্যান্য জাতিগুলোকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গোলাম বানানো। জায়েয ও নাজায়েয ব্যবসা-বাণিজ্যের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের আলেম সমাজ যখন অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোনো ফতোয়া দেন, তখন তারা ভুলে যান যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মহাজনী সুদের কোনো গুরুত্ব নেই। দারিদ্র্য ও দুরবস্থা সেই জিনিসেরই সৃষ্টি যাকে তাঁরা জায়েয বলে থাকেন, অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ ও ব্যাংক ব্যবস্থা।

উত্তর ঃ যেসব দোষ-ত্রুটির কথা আপনি এখানে উল্লেখ করেছেন, তা এমন প্রতিটি স্থানে সৃষ্টি হয় যেখানে আইন-কানুনের উদ্দেশ্যে তার স্পিরিটকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তার শব্দের দিকে ধাবিত হয়। কোথাও এসব ত্রুটিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার স্বল্পতার কারণে সৃষ্টি হয়। আবার কোথাও এ কারণে সৃষ্টি হয় যে, মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইনের স্পিরিটের

সাথে বিদ্রোহ করতে চায়, কিন্তু কায়েম রাখার জন্য আইনের রূপ পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকে। আমাদের যদি কোনো জিনিস এ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে তা হবে শুধু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের চেতনা জাগ্রত করা এবং কার্যত তা অনুসরণ করে চলা। এসব জিনিস বিদ্যমান থাকলে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার জন্য তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই এমন লোকদের নির্বাচন করবে যারা কুরআন ও সুন্নাহর শুধু শব্দের অর্থই বুঝেন না, বরং এর স্পিরিটও ভাল করে বুঝেন।[১]

প্রশ্ন ঃ মুসলিম মুফাসৃসির ও ভাষ্যকারগণের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছাড়াও ধর্মীয় ব্যাপারে যে মতভেদ আছে, সে সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? আপনার দৃষ্টিতে এসব মতভেদ কি ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের পথে বাধার সৃষ্টি করবে না ?

উত্তর ঃ এসব মতভেদের ধরন আমাদের মধ্যকার অন্যান্য মতভেদের অনুরূপ। অন্যান্য সমস্যার সমাধানের মতই আমরা এসব সমস্যার সমাধান করতে পারি। এমন কোনো সমাজ নেই, যেখানে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এসব মতভেদকে কোথাও এমন প্রতিবন্ধক হবার সুযোগ দেয়া হয় না, যা জীবন চলার গতিপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। মতভেদ দূর করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হলো, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেই আদর্শের ভিত্তিতে চলবে, যে আদর্শ অধিকাংশ লোক গ্রহণ করবে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে বেশীর পক্ষে এতটুকু বিবেচনা করা যেতে পারে যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী নীতিমালার মধ্যে শামিল হতে পারবে। আর তাদের অধিকারের সংরক্ষণ হবে ইনসাফের ভিত্তিতে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সেই ব্যাপক ও বিস্তৃত নীতিমালার উপর স্থাপন করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাবো, যে নীতিমালার উপর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একমত হবে। এরপর এমনকিছু লোক অবশিষ্ট থাকবে, যারা অধিকাংশের সাথে এ ব্যাপক নীতিমালার ব্যাপারে একমত হবে না। এ বিষয়েও আমাদেরকে উপরোল্লিখিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। তা না হলে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হবে যে, আমরা সকল অনৈসলামী ব্যাপারে এজন্যএকমত হবো যে, আমরা ইসলামের ব্যাপারে একমত হতে পারিনি।

---

১. সময় স্বল্পতার কারণে সেসব অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আলোকপাত করা গেলো না, যা প্রশ্নকর্তা তার প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের বই 'সুদ' ও 'অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান' বই অধ্যয়ন করুন।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছাড়াও দেশের সংখ্যালঘুদের সমস্যাটিও লক্ষ্যণীয়। আপনি কিভাবে তাদেরকে একথার উপর সম্মত করাবেন যে, তারা মুসলমানদের ধর্মীয় রাষ্ট্রকে মেনে নেবে এবং এর প্রতি আবার বিশ্বস্তও থাকবে ?

উত্তর ঃ এ সমস্যার সমাধানও তাই যা মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতভেদের সমাধান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি দেশের শাসনব্যবস্থা সেইসব নীতিমালা অনুযায়ী গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয়, যা অধিকাংশের রায়ে সঠিক বলে বিবেচিত হয়। সংখ্যালঘু দল তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করার দাবী অবশ্যই জানাতে পারে। এ ছাড়াও তাদের নাগরিক অধিকার ও 'পার্সোনাল ল' সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের জন্য তাদের মত পরিবর্তন করুক ইনসাফের দৃষ্টিতে তারা এ দাবী উত্থাপন করতে পারে না। এদেশের সংখ্যাগুরু মানুষ ঈমানদারীর পথে এ মত পোষণ করে যে, ইসলাম অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যেই দেশবাসীর কল্যাণ নিহিত। তাদের মতামত অনুযায়ী দেশের শাসন ব্যবস্থা চলুক, এ দাবী উত্থাপন করার অধিকার তাদের থাকা উচিত। সংখ্যালঘু দল তাদের অধিকার সংরক্ষণের দাবী উঠাতে পারে। কিন্তু একথা বলতে পারে না যে, সংখ্যাগুরু দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো নীতিমালায় তাদের কল্যাণ অনুসন্ধান করুক। এখন বাকী থাকলো বিশ্বস্ততার প্রশ্ন। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে, বিশ্বস্ততার সম্পর্ক কোনো রাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক হওয়া বা ধর্মহীন হওয়ার সাথে নয়, বরং ইনসাফ, সৌজন্য ও উদারতার উপর নির্ভরশীল, যা সংখ্যাগুরু দল সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রদর্শন করবে। আপনি সংখ্যালঘুদের শুধু প্রদর্শনী করে নিশ্চিত করতে পারবেন না যে, দেখো তোমাদের জন্য আমরা আমাদের ধর্ম পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি এবং এটাকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছি। সংখ্যালঘুরাতো দেখবে, আপনারা তাদের সাথে ইনসাফ করছেন কিনা ? আপনাদের আচরণ জাতীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণ হৃদয়বৃত্তির উপর ভিত্তিশীল, না উদারতা ও সহনশীলতার উপর ভিত্তিশীল ? এ অভিজ্ঞতাই প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত দেবে যে, সংখ্যালঘুরা এ দেশে বিশ্বস্ত হয়ে বসবাস করবে, না অশান্ত মনে।

প্রশ্ন ঃ আমার মতে প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অধিবাসীদের রসম রেওয়াজ, আখলাক, ঐতিহ্য, আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণারই প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বয়ং কোনো দর্শন অথবা ধর্মের বাহক

হতে পারে না। যদি তাকে এরূপ বানানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা একটি কৃত্রিম ও সাময়িক প্রচেষ্টায় পরিণত হবে। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র এরিস্টোটলের কল্পনার সৃষ্ট ছিল না, বরং চিন্তার এই ধারা এবং জীবন দর্শনের ফসল ছিল, যা সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে অভিন্ন ছিল। এভাবে যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করতে চাই, তাহলে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সঠিক ইসলামী স্পিরিট সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে দীনের আসল মূল্যবোধ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করাতে হবে। এ মূল্যবোধ যখন মজবুত হয়ে যাবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রে ইসলামী দৃষ্টিভংগী পরিপূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করবে, তখনই আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বয়ং ইসলামী রং ধারণ করবে। আমরা সেই সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ বপন করতে পারবো না যতক্ষণ আমাদের রূহানী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামী রীতিনীতি ঔজ্জ্বল্যের সাথে বিকশিত না হবে। আমার দৃষ্টিতে সেই সময় এখনো দূরে আছে, যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী মূল্যবোধ গ্রহণ করবো। এ জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সার্বিক প্রচেষ্টা সময়ের কিছু আগে থেকে চলেছে। আমাদের বুনিয়াদ এখনো এতটা শক্তিশালী হয়নি যে, আমরা এর উপর একটি ইমারত দাঁড় করাতে পারি।

উত্তর ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন যে, একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এর অধিবাসীদের নৈতিক ও মানসিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি। এখন যদি এদেশের অধিবাসীগণ ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণ রাখে এবং তাদের মধ্যে ইসলামের পথে অগ্রসর হবার আগ্রহ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র কেন তাদের এ আকর্ষণ ও আগ্রহের প্রতিচ্ছবি হবে না ? আপনার একথাও সম্পূর্ণ সঠিক যে, আমরা যদি এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে চাই তাহলে এদেশবাসীর মধ্যে ইসলামী চিন্তা চেতনা, ইসলামী মানসিকতা এবং ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু আমার বুঝে আসছে না যে, এ চেষ্টায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপনি স্বয়ং রাষ্ট্রকে বাদ রাখতে চাচ্ছেন কেন ? ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের আগের অবস্থাতো এই ছিল যে, আমাদের উপর একটি অমুসলিম শক্তি ক্ষমতাসীন ছিল। এ কারণে আমরা ইসলামী রূপরেখার ভিত্তিতে নিজেদের জাতি গঠনে রাষ্ট্র এবং তার শক্তি ও উপায় উপকরণ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছিলাম না। বরং প্রকৃতপক্ষে এ সময় গোটা প্রশাসনিক শক্তির বলে আমাদেরকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো এবং আমরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় ইসলামী জীবনের পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হলো। এরপর আমাদের

সামনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্র কি ইসলামী জীবন গঠনে সেইভাবে অংশগ্রহণ করবে, যা একজন নির্মাতার ব্যাপারে হয় ? অথবা সেই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে, যা একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির হয়ে থাকে ? অথবা আজও সেই বিগত দিনের অবস্থাই বহাল থাকবে যে, আমাদেরকে শুধু রাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই নয়, বরং বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ইসলামী জীবন গঠনের কাজ করতে হবে ? এখন যেহেতু দেশের ভবিষ্যত জীবনব্যবস্থা নির্মাণাধীন আছে তাই আমরা চাই, তা এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক যা ইসলামী জীবনের নির্মাতা হবে। আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ হয়, তাহলে রাষ্ট্রের বিপুল উপায়-উপকরণ ও শক্তিকে ব্যবহার করে দেশের জনগণের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন করা খুব সহজ হয়ে যাবে। অতপর যে হারে আমাদের সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকবে, সেই হারে আমাদের রাষ্ট্রও একটি পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকবে।-(১৮ মে, ১৯৪০ ঈসায়ী)

মরণের পরের জীবন

মৃত্যুর পরে কি কোনো জীবন আছে ? থাকলে তা কী রকমের জীবন ? এ প্রশ্নটি মূলত আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির সীমা বহির্ভূত। কারণ মৃত্যু সীমার ওপারে কি আছে আর কি নেই, তা উঁকি মেরে দেখার মতো চোখ আমাদের নেই। ওপারের কোনো আওয়াজ শোনার মতো কান আমাদের নেই। এমন কি, ওপারে আদৌ কিছু আছে কিনা, তা নিশ্চিতরূপে জানার মতো কোনো যন্ত্রও আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। কাজেই বিজ্ঞানের দিক থেকে বলতে গেলে, এ প্রশ্ন তার সম্পূর্ণ সীমা বহির্ভূত। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে, সে নিসন্দেহে একটি অবৈজ্ঞানিক কথা বলে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেখানে কোনো জীবন আছে একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি কোনো জীবন নেই, একথাও বলা চলে না। কাজেই ঐ সম্পর্কে অন্তত কোনো নিশ্চিত জ্ঞানসূত্র না পাওয়া পর্যন্ত যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এ হতে পারে যে, আমরা পারলৌকিক জীবনকে স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করবো না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে কি এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা চলে ? আদৌ নয়। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে কোনো একটা জিনিসকে জানবার উপায় উপকরণ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হওয়া পর্যন্ত সে সম্পর্কে নেতিবাচক বা ইতিবাচক কোনোরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু সেই বস্তুটির সাথে যখন আমাদের বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তখন আর স্বীকৃতির ওপর কর্মনীতি নির্ধারণ না করে কোনো উপায় থাকে না। উদাহরণত বলা যায়, একটি লোক সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। তার সাথে যদি আপনার কোনো কাজ কারবার না থাকতো তার ঈমানদার হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা আপনার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তার সাথে যদি আপনাকে কোনো কারবার করতে হয়, তাহলে হয় তাকে ঈমানদার, নচেত বেঈমান ভেবে কাজ করতে আপনি বাধ্য। আপনি মনে মনে অবশ্যই ধারণা করতে পারেন যে, লোকটি ঈমানদার কি বেঈমান প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সন্দিগ্ধচিত্তে কাজ করবো। কিন্তু তার ঈমানদারিকে সন্দেহজনক ভেবে আপনি যে কাজ করবেন, কার্যত তার ধরন তাকে বেঈমান মনে করার মতোই হবে। কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্যে সন্দিগ্ধ অবস্থাটা শুধু মনের মধ্যেই থাকতে পারে, বাস্তব কর্মনীতি কখনো সন্দিগ্ধ অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে না। তার জন্য স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি একান্তই অপরিহার্য।

একটু সামান্য তলিয়ে চিন্তা করলেই এটা বুঝা যেতে পারে যে, পারলৌকিক জীবনের প্রশ্নটি নিছক একটি দার্শনিক প্রশ্নই নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে তার গভীরতর সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের গোটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই এ প্রশ্নের ওপর নির্ভরশীল। আমার যদি ধারণা হয় যে, জীবনের সবকিছু এ পার্থিব জীবনেই শেষ এবং এরপর আর কোনো জীবন নেই, তাহলে নৈতিক আচরণ এক ধরনের হবে। আর যদি আমি এ ধারণা রাখি যে, এরপরে আরো একটি জীবন আছে, যেখানে আমাকে বর্তমান জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং আমার এ জীবনের কৃতকর্মের ভিত্তিতেই সেখানে ভালো বা মন্দ পরিণাম ভোগ করতে হবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমার নৈতিক আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে। এর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে ভ্রমণ করছে যে, তাকে এখান থেকে শুধু করাচী যেতে হবে। করাচী পৌঁছার পর তার ভ্রমণ শুধু চিরতরে সমাপ্তিই লাভ করবে না, বরং সেখানে সে পুলিশ, আদালত এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী সকল শক্তিরই একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাবে।

পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি মনে করে যে, এখান থেকে করাচী পর্যন্ত তার ভ্রমণের একটি মনযিল মাত্র। এরপর তাকে সমুদ্রপারের অপর একটি দেশে যেতে হবে, যেখানকার বাদশাহ এ দেশেরও বাদশাহ। সে বাদশার দফতরে তার পাকিস্তানে থাকাকালীন যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের গোপন রেকর্ড বর্তমান রয়েছে। সেখানে সে স্বীয় কর্মের দৃষ্টিতে কিরূপ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, তা তার সেই রেকর্ড বিচার বিশ্লেষণ করে স্থির করা হবে। এখন এ দুই ব্যক্তির কর্মনীতি কতোখানি পরস্পর বিরোধী হবে, আপনারা তা সহজেই আন্দাজ করতে পারেন। প্রথম ব্যক্তি এখান থেকে শুধু করাচী পর্যন্ত ভ্রমণের প্রস্তুতি নেবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রস্তুতি নেবে পরবর্তী দীর্ঘ মনযিলগুলোর জন্যও। প্রথম ব্যক্তি মনে করবে, লাভ ক্ষতি যা কিছু করাচী পৌঁছা পর্যন্তই, তারপরে আর কিছু নেই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ধারণা করবে যে, আসল লাভ ক্ষতি ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ে নয়, বরং তা রয়েছে শেষ পর্যায়ে। প্রথম ব্যক্তি তার ক্রিয়াকলাপের কেবল সেসব ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যা করাচী পর্যন্ত প্রকাশ পেতে পারে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি থাকবে সেসব ফলাফলের প্রতি যা সমুদ্রপারের সেই দেশটিতে গিয়ে প্রকাশ পাবে। স্পষ্টত এ দু' ব্যক্তির কর্মনীতির পার্থক্য তাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত ধারণারই প্রত্যক্ষ ফল। ঠিক এরূপে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কীত ধারণা বিশ্বাস আমাদের নৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত

করে এবং তার ধারাকে চূড়ান্তরূপে নির্ণয় করে দেয়। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ করতে হলে আমরা এ জীবনকে প্রথম এবং সর্বশেষ জীবন ভেবে কাজ করছি, না পরবর্তী কোনো জীবন ও তার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখছি, এ প্রশ্নের ওপরই সে পদক্ষেপের দিক নির্ণয় নির্ভর করে। প্রথম অবস্থায় আমাদের পদক্ষেপ হবে এক ধরনের আর দ্বিতীয় অবস্থায় তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

এর থেকে জানা গেলো যে, পারলৌকিক জীবনের প্রশ্নটি নিছক একটি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন নয়, বরং এটি বাস্তব জীবনের প্রশ্ন। এমতাবস্থায় এ সম্পর্কে সন্দেহ ও দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার কোনোই অবকাশ নেই। সন্দিগ্ধ অবস্থায় যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করবো শেষ পর্যন্ত তা অবিশ্বাসীরই দৃষ্টিভঙ্গি হবে। কাজেই যে কোনো দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, মৃত্যুর পরে কোনো জীবন আছে কিনা এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে আমরা বাধ্য। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য না করলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

এখন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রমাণের জন্য আমাদের কাছে কি কি উপকরণ আছে, তাই একটু বিচার করে দেখা যাক। আমাদের সামনে প্রথম উপকরণ হচ্ছে মানুষ, আর দ্বিতীয় উপকরণ এ বিশ্বব্যবস্থা। আমরা মানুষকে এ বিশ্বব্যবস্থার পটভূমিতে রেখে যাচাই করে দেখবো, মানুষ হিসেবে তার সমস্ত চাহিদা ও দাবী দাওয়া কি এ ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না কোনো জিনিস অপূরণীয় থাকার ফলে তার জন্য ভিন্নরূপ কোনো ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ? মানুষের দেহটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, এটা বহু খনিজ দ্রব্য, লবণ, পানি এবং গ্যাসের সমষ্টি। এর পাশাপাশি বিশ্বজগতেও মাটি-পাথর, ধাতু, লবণ, গ্যাস, নদী এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বর্তমান। এ জিনিসগুলোর নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য বিধানের প্রয়োজন। বিশ্বজগতের সর্বত্র তা ক্রিয়াশীল রয়েছে। সেই বিধান বাইরের পরিবেশে যেমন পাহাড়, নদী ও বাতাসকে নিজ নিজ কাজ সম্পাদনের সুযোগ দিচ্ছে, তেমনি মানব দেহও তার অধীনে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের দেহ তার চারপাশের বস্তুনিচয় থেকে খাদ্যগ্রহণ করে বিকাশ-বৃদ্ধি লাভ করছে। এ ধরনের নিয়ম বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঘাস ইত্যাদি সৃষ্টিজগতেও বর্তমান এবং এখানেও বর্ধনশীল দেহধারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিধানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, মানুষের দেহ

একটি জীবন্ত সত্তা, যা নিজ ইচ্ছায়ই নড়াচড়া করে, নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে, নিজের হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই পালন করে এবং নিজের বংশ রক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করে থাকে। সৃষ্টিজগতে এ ধরনের আরো বহুবিধ জীবের অস্তিত্ব বর্তমান। জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলে এরূপ অসংখ্য জীবজন্তু লক্ষ্য করা যায়, যাদের গোটা জীবনের ওপর পরিব্যাপ্তি থাকার উপযোগী আইন বিধানও এখানে পুরোপুরি ক্রিয়াশীল।

এ সবের ওপর মানুষের আর একটি সত্তা রয়েছে, যাকে আমরা নৈতিক সত্তা বলে অভিহিত করি। তার মধ্যে সৎকাজ ও দুষ্কৃতি করার অনুভূতি আছে। সৎকাজ ও দুষ্কৃতির পার্থক্য বোধ আছে। সৎকাজ ও দুষ্কৃতি করার শক্তি আছে। তার প্রকৃতি সৎকাজের ভালো ফল এবং দুষ্কৃতির মন্দ ফল প্রত্যাশা করে। যুলুম ইনসাফ, সত্যবাদিতা, মিথ্যাচার, হক, নাহক, দয়াশীলতা, নিষ্ঠুরতা, কৃতজ্ঞতা, বদান্যতা, কৃপণতা, আমানতে খেয়ানত এবং এ ধরনের বিভিন্ন নৈতিক গুণের মধ্যে সে স্বভাবতই পার্থক্য করে থাকে। এ গুণসমূহ কার্যত তার জীবনে লক্ষ্য করা যায়। এগুলো কোনো কাল্পনিক জিনিস নয়, বরং বাস্তবক্ষেত্রে মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার ওপর এগুলো প্রভাবশীল হয়ে থাকে। কাজেই মানুষ স্বভাবগতভাবেই তার ক্রিয়াকর্মের প্রাকৃতিক ফলাফলের মতোই নৈতিক ফলাফল তীব্রভাবে প্রত্যাশা করে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন, এ ব্যবস্থাপনায় মানবীয় ক্রিয়াকর্মের নৈতিক ফলাফল কি পুরোপুরি প্রকাশ পেতে পারে ? আমি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এখানে নৈতিক সত্তার অধিকারী অপর কোনো জীবনের অস্তিত্ব নেই। পরন্তু গোটা বিশ্বজগত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে চালিত হচ্ছে। এর কোথাও নৈতিক বিধানকে ক্রিয়াশীল দেখা যায় না। এখানে রূপার ওজন এবং মূল্য দুইই আছে, কিন্তু সত্যের ওজন বা মূল্য কোনোটিই নেই। এখানে আমের বীজ থেকে হামেশা আম গাছই জন্মে, কিন্তু সত্যের বীজ বপনকারীদের প্রতি কখনো পুষ্পবৃষ্টি আর কখনো (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে) জুতা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এখানে বস্তুগত উপাদানগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান আছে, সেই বিধান অনুসারে হামেশা সুনির্দিষ্ট ফলাফল প্রকাশ পায়। কিন্তু নৈতিক উপাদানগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান নেই, সেগুলোর ক্রিয়াশীলতার ফলে হামেশা নির্দিষ্ট ফলাফলও প্রকাশ পায় না। প্রাকৃতিক বিধানের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যের ফলে এখানে কখনো নৈতিক ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে, কখনো প্রকাশ পেলেও প্রাকৃতিক বিধান যতোটুকু অনুমতি দেয় কেবল

ততোটুকুই প্রকাশ পায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এরূপও দেখা যায় যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কাজের একটি বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকলেও প্রাকৃতিক বিধানের হস্তক্ষেপে ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ নিজেও তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি বাঁধাধরা নিয়মে তার ক্রিয়াকর্মের নৈতিক ফলাফল লাভের কিঞ্চিৎ প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা খুবই সীমিত এবং অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। একদিকে প্রাকৃতিক বিধান তাকে সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ করে রেখেছে, অপরদিকে মানুষের নিজস্ব দুর্বলতা এ ত্রুটিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে চাই। ধরুন, এক ব্যক্তি যদি অন্য এক ব্যক্তির শত্রু হয় এবং তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, তবে ঘরটি পুড়ে যাবে। এটা তার কাজের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ফল। এর নৈতিক ফলস্বরূপ সেই ব্যক্তির ততোখানি শাস্তি হওয়া উচিত, যতোখানি সে একটি পরিবারের ক্ষতি করেছে। কিন্তু এ ফল প্রকাশ পাওয়া, তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা, তার অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া, আদালত কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ পরিবার ও তার ভবিষ্যত বংশধরদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে অপরাধীকে ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তিদান করা, এ শর্তগুলোর কোনো একটি যদি পূর্ণ না হয় তাহলে নৈতিক ফল হয় আদৌ প্রকাশ পাবে না, কিংবা তার খুব সামান্য অংশই প্রকাশিত হবে। আবার এমনো হতে পারে যে, নিজের শর্তকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সেই ব্যক্তি দুনিয়ায় পরম সুখে কালাতিপাত করতে থাকবে।

এর চাইতেও বড় রকমের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। কতিপয় ব্যক্তি নিজ জাতির ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে বসে এবং গোটা জাতি তাদের অঙ্গুলি সংকেতে চলতে থাকে। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তারা লোকদের মধ্যে জাতিপূজার উৎকট মনোভাব এবং সাম্রাজ্যবাদী উন্মাদনার সঞ্চার করে। এভাবে তারা আশপাশের জাতিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে, লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোক হত্যা করে, দেশের পর দেশ ধ্বংস করে ফেলে, কোটি কোটি মানুষকে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবনযাপনে বাধ্য করে। তাদের এ কীর্তিকলাপ স্বভাবতই মানবেতিহাসে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এবং সে প্রতিক্রিয়া পুরুষানুক্রমে যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকবে। আপনি কি মনে করেন এ কতিপয় ব্যক্তি যে মহাঅপরাধ করছে তার যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তি কখনো এ পার্থিব

জীবনে পেতে পারে ? স্পষ্টতই বলা যায়, তাদের দেহ থেকে যদি সমস্ত গোশত কেটে ফেলা হয় কিংবা তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে দেয়া হয় অথবা মানুষের আয়ত্তাধীনে অপর কোনো কঠিন শাস্তিও দেয়া হয় তবু তারা কোটি কোটি মানুষ এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে সে পরিমাণ শাস্তি তারা কখনো পেতে পারে না। কারণ বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা যে প্রাকৃতিক বিধানের দ্বারা চালিত, তদনুসারে অপরাধতুল্য শাস্তি পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

অনুরূপভাবে দুনিয়ার আদর্শ মহাপুরুষদের কথা বলা যেতে পারে। তাঁরা মানব জাতিকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনযাপনের জন্য আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের অকৃপণ দানের ফলে অসংখ্য মানুষ পুরুষানুক্রমে যুগের পর যুগ কল্যাণ লাভ করে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো কতকাল লাভ করবে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব মহাপুরুষ কি এ দুনিয়ায় তাঁদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল লাভ করতে পারেন ? আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে, বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে এক ব্যক্তি তার এমন কাজেরও প্রতিফল লাভ করতে পারে, যার প্রতিক্রিয়া তার মৃত্যুর পরও হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ?

আমি উপরেই বলেছি, প্রথমত বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যে বিধানের দ্বারা চালিত তাতে মানবীয় ক্রিয়াকর্মের পূর্ণ নৈতিক ফল লাভ করার কোনোই অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত, এখানকার ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ যে কাজ করে থাকে, তার প্রতিক্রিয়া এতো সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী যে, তার পূর্ণ ফলাফল ভোগ করার জন্য হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ বছর দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে মানুষের পক্ষে এতো দীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভবপর নয়। এর থেকে জানা গেলো যে, মানব সত্তার মৃত্তিক, আঙ্গিক ও জৈবিক উপাদানগুলোর জন্য বর্তমান প্রাকৃতিক জগত (Physical World) এবং তার প্রাকৃতিক বিধানগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু তার নৈতিক উপাদানের জন্য এ দুনিয়া একেবারেই অপর্যাপ্ত। তার জন্য অন্য একটি বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজন, যেখানে নৈতিক বিধান হবে কর্তৃত্বশীল আইন (Governing Law) আর প্রাকৃতিক বিধান তার অধীনে থেকে শুধু সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। সেখানে জীবন সীমিত না হয়ে অসীম হবে এবং এখানে অপ্রকাশিত বা ভিন্নরূপে প্রকাশিত সকল নৈতিক ফলাফলই সেখানে সঠিক ও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। সেখানে সোনা ও রূপার

পরিবর্তে সৎকাজ ও সত্যতার ওজন ও মূল্য হবে। সেখানে আগুন কেবল তাকেই জ্বালাবে, যে নৈতিক কারণে দগ্ধ হওয়ার উপযুক্ত। সেখানে সৎলোকেরা সুখ শান্তি পাবে আর দুষ্কৃতিকারীরা দুঃখবোধ করবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রকৃতি স্বভাবতই এমনি একটি বিশ্বব্যবস্থা দাবী করে।

এ ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে শুধু 'হওয়া উচিত' পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েই তার কাজ শেষ করে। এখন প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোনো জগত আছে কিনা, এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান উভয়ই অক্ষম। এ ব্যাপারে একমাত্র কুরআনই আমাদেরকে সাহায্য করে ও তার ঘোষণা এই যে, তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি যে জিনিসটি দাবী করে, মূলত হবে ঠিক তাই। বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যবস্থা একদিন চূর্ণ করে ফেলা হবে এবং তারপর এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে আসমান, যমীন এবং তার মধ্যকার বস্তুনিচয় এক ভিন্নরূপ ধারণ করবে। অতপর সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যারা এসেছে তাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং এক সাথে সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি এবং গোটা মানব গোষ্ঠীর কর্মের রেকর্ড নির্ভুল ও নিখুঁত অবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে। এ দুনিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজের কতোখানি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ সেখানে মওজুদ থাকবে। এ প্রতিক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানবগোষ্ঠীই সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত থাকবে। যেসব অণু-পরমাণুর ওপর মানুষের কথা ও কাজের ছাপ পড়েছে তারাও নিজ নিজ কাহিনী পেশ করবে। খোদ মানুষের হাত-পা, চোখ-কান, জিহবা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদেরকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তার সাক্ষ্য দান করবে। অতপর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এসব কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে কে কতোটা পুরস্কার আর কতোটা শাস্তির উপযুক্ত, পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা ঘোষণা করবেন। এ পুরস্কার বা শাস্তির পরিধি এতো ব্যাপকতর হবে যে, বর্তমান জগতের সীমিত মাপকাঠির ভিত্তিতে তা অনুমান করাও অসম্ভব । সেখানে সময় ও স্থানের মাপকাঠি ভিন্নরূপ এবং প্রাকৃতিক বিধানও অন্যরকম হবে। মানুষের যেসব সৎকাজের প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে সেখানে তার পুরোপুরি প্রতিফল লাভ করা যাবে। মৃত্যু, ব্যাধি, বার্ধক্য তার সুখ শান্তিতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তার যে দুষ্কৃতির প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে

অসংখ্য মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তার পূর্ণশাস্তিও ভোগ করতে হবে। মৃত্যু বা অজ্ঞানতা এসে সে শাস্তি থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না।

এমন একটি জীবন ও জগতকে যারা অসম্ভব মনে করে, তাদের মানসিক সংকীর্ণতার জন্য আমার অনুকম্পা হয়। আমাদের বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যদি বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানসহ বিদ্যমান থাকতে পারে, তাহলে অন্য একটি বিশ্বব্যবস্থা অপর কোনো প্রাকৃতিক বিধানসহ কেন বর্তমান থাকতে পারবে না। অবশ্য এরূপ জগতের সম্ভাবনা কোনো বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা চলে না। এর জন্য ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের একান্তই প্রয়োজন।-(জুন, ১৯৪১ ঈসায়ী)

সমাপ্ত